তারবিয়াতুস সালিক

(আল্লাহ্‌প্রেমিকদের আত্মশুদ্ধির পথ)

তারবিয়াতুস সালিক

(আল্লাহ্‌প্রেমিকদের আত্মশুদ্ধির পথ)

মূল

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা

আশরাফ আলী থানভী রহ.

অনুবাদ

হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর খলিফা আলহাজ্জ
আব্দুর রশীদ সাহেবের দুআ ও নির্দেশক্রমে

মাওলানা মাসউদুর রহমান

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

‘তারবিয়াতুস সালিক’ ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায়-৩

তারবিয়াতুস সালিক

(আল্লাহ্‌প্রেমিকদের আত্মশুদ্ধির পথ)

সপ্তম মুদ্রণ	জুলাই ২০১৮
প্রথম প্রকাশ	জুলাই ২০১১
প্রকাশনা সংখ্যা	১
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
প্রকাশনায়	**রাহনুমা প্রকাশনী** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ-০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ৫০০/- (পাঁচশো টাকা মাত্র)

ISBN : 978-984-33-3780-1
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail
Web : www.rahnumabd.com

TERBIYATUS SALIK
by Mawlana Ashraf Ali Thanovi, Transleted by Mawlana Maswoodur Rahman
Published by: Rahnuma Prokashoni, Price: Tk. 500.00, US $ 15.00 only.

উৎসর্গ–

আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ
আমার এসলাহের মুরব্বি
আলহাজ্জ আব্দুর রশীদ সাহেব
হুজুর এর দস্তমুবারকে...

তাঁর পীর হাফেজ্জী হুযূর রহ.
ও
তাঁর পীর হযরত থানভী রহ.
এর দারাজাত বুলন্দীর উদ্দেশ্যে।

হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর খলিফা
আলহাজ্জ আব্দুর রশিদ সাহেবের
বাণী ও দুআ

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মাবাদ, হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. বারবার বলতেন যে, হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. প্রতিটি বিষয়ে বই-পুস্তক লিখে গিয়েছেন। কাজেই নতুন করে বই-পুস্তক লেখার আর কোনো দরকার নেই। যেহেতু তিনি উর্দু, আরবীতে কিতাবাদি লিখেছেন কাজেই সেইগুলি বাংলায় তরজমা করা দরকার। যাতে বাংলা ভাষা-ভাষীদের উপকার হয়। শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. থানভী রহ. এর বই-পুস্তক বাংলায় তরজমা করতেন। সফরে ও হযরে তার ব্যাগের মধ্যে সবসময় থানভী রহ.-এর বই-পুস্তক থাকত। মৌঃ আব্দুস সালাম সাহেব থানভী রহ. এর মুরীদ ছিলেন। তিনি থানভী রহ. এর মাওয়াযের অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতেন তাঁর সম্পাদিত মাসিক নেয়ামত পত্রিকায়। তিনি হযরতের মাওয়ায়েয 'আল এবকা' পঁয়ত্রিশ খণ্ড বাংলায় প্রকাশ করেছিলেন।

হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর খাস কামরায় প্রত্যহ বাদ আছর সমবেত শিক্ষক মণ্ডলী ও সালেকীনদের মজলিসে থানভী রহ. এর 'তারবিয়াতুস সালিক' পড়ে শোনানো হত। আমরা তাতে শরিক হতাম। সফরের সময় হাফেজ্জী হুযূর রহ. থানুভী রহ. এর 'কামালাতে আশরাফিয়া' কিতাব সঙ্গে রাখতেন এবং বিভিন্ন মজলিসে পড়ে শোনাতেন। আশরাফ চরিত এবং হযরতের জীবনী গ্রন্থে ইসলাহি চিঠি সন্নিবেশিত দেখে হযরত হাফেজ্জী হুযূর খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন।

আমরা খানকায়ে আশরাফিয়ার পক্ষ থেকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, থানভী রহ. এর বই-পুস্তক যথাসম্ভব তরজমা

করার উদ্যোগ নিব ইনশাআল্লাহ্। ইতিমধ্যে হাফেয মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেব 'তারবিয়াতুস সালিক' কিতাবের ১ম, ২য় ও ৩য় অধ্যায় বাংলা অনুবাদ করে আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। যা দেখে আমাদের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়েছে। আমরা আশা করি এই কিতাবটির অনুবাদ সম্পূর্ণ হলে কামলাতে আশরাফিয়া কিতাবটিরও তরজমা হয়ে প্রকাশ ও প্রচার হবে।

'বেহেশতী জেওর' কিতাবটির ব্যাপারে আমাদের আশা এগার খণ্ডের প্রতি অধ্যায় যাচাই বাছাই করে বর্তমান পরিস্থিতি ও হাল চিন্তা করে কিছু মাসআলা যোগ, বিয়োগ করে বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে সংযোগী বই প্রকাশ ও প্রচার হবে। এরপর যতটুকু সম্ভব থানভী রহ. এর সাড়ে এগার শ রচনাবলী থেকে বিশেষ বিশেষ কিতাবসমূহ বঙ্গানুবাদ হয়ে প্রকাশ ও প্রচার হবে।

দুআ করি দয়াময় আমাদের তামান্না পুরা করুন এবং হাফেয মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেবকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন। এই কাজ করার পূর্ণ যোগ্যতা দান করুন ও জাযায়ে খায়ের নসীব করুন এবং শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. এর ফয়েয ও বরকত নসীব করুন। আমীন।

(আলহাজ্জ আব্দুর রশিদ)
খলিফা, হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.

অনুবাদকের কথা

'তারবিয়াতুস সালিক' হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. (১২৮০ হি.– ১৩৬২ হি.) এর এসলাহী খিদমতের এক ব্যতিক্রমী উদ্দ্যোগ। হযরতের সঙ্গে যাদের এসলাহী তাআল্লুক ছিল, তারা নিজেদের হাল ও অভিব্যক্তি, ওয়াসওয়াসা বা সংশয় ইত্যাদি জানিয়ে তাঁর নিকট পত্র লিখতেন এবং সেগুলো পাঠ করে তিনি নিজেই প্রয়োজনীয় পরামর্শ, অভিমত, বিশ্লেষণ বা এলাজ লিখে তাদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। পরবর্তীতে বহু মানুষের অনুরোধে হযরত সেইসব চিঠিপত্র ও জবাব সংকলিত করেন এবং তার নাম নির্বাচন করেন তারবিয়াতুস সালিক।

হযরত থানভী রহ. এর রচনা ও কিতাবাদি বাংলা অনুবাদের ফলে এ-দেশের মানুষের কাছে তাঁর ও তাঁর রচনাবলীর রয়েছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা। সে হিসাবে বহু পূর্বেই তারবিয়াতুস সালিকের বাংলা অনুবাদ হওয়া উচিৎ ছিল। তাছাড়া এর মাধ্যমেই এসলাহ ও আত্মশুদ্ধির ময়দানে তাঁর মুজাদ্দিদ সুলভ স্বকীয়তার প্রকাশ ঘটেছে সর্বাধিক। তাসাওউফের পূর্ণাঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ না হওয়ায় এ দেশের ইসলাহ প্রত্যাশীগণ এর বরকত থেকে এতকাল মাহরূম রয়ে গেছেন। অবশ্য গ্রন্থটির গুরুত্ব অনুধাবনকারী উলামায়ে কেরাম এযাবত মূল গ্রন্থ থেকেই উপকৃত হয়ে আসছেন। এর অসাধারণ প্রভাবের কারণেই হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. নূরিয়া মাদরাসায় আসাতিযায়ে কেরামের (শিক্ষকদের) মজলিসে আজীবন এ কিতাবের তালিম চালু রেখেছিলেন এবং উর্দূ না জানা এসলাহ প্রত্যাশীদের কাছেও এই কিতাবের কল্যাণ পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে ওলামায়ে কেরামের অনেকের কাছেই তিনি বলতেন- 'কিতাবটির বাংলা অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।'

যথোপযুক্ত উলামায়ে কেরাম সম্ভবত নিজেদের নানামুখী দীনী ব্যস্ততার কারণে এরজন্য সময় বের করতে পারেন নি। ফলে হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. দিলের ঐ আকাঙ্ক্ষা দিলে নিয়েই মাহবুবের দরবারে চলে গেছেন।

আমার শায়েখ ও মুর্শিদ আলহাজ্জ আব্দুর রশিদ সাহেব (আল্লাহ্ তাকে নেক হায়াত দান করুন) নিজ পীর হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর ঐ অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করতেন এবং অনুবাদ বিষয়ক অন্তরের ব্যাকুলতা প্রকাশ করতেন। একদিন বেশ কয়েকজন খলিফার উপস্থিতিতে তিনি বললেন আমরা খানকায়ে আশরাফিয়া টাঙ্গাইলের পক্ষ থেকে মাওলানা মাসউদ সাহেবকে তারবিয়াতুস সালিক অনুবাদের অনুরোধ করছি। তিনি আরও বলেছিলেন হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর কাছে গিয়ে অন্তত বলতে পারব ''আপনার দিলের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে এসেছি। তারবিয়াতুস সালিক বাংলা ভাষার মানুষের হাতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি।''

জুলাই ২০০৮ইং এর সেইদিন থেকে নিজের অযোগ্যতার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে 'আল্লাহ্ওয়ালাদের দিলের তামান্না পূরণ হবে' এবং 'হয়ত এতে নিজের নাজাতের কোনো বাহানা হয়ে যাবে' সেই আশায় বুক বেধে অধম অবিরাম সাদা কাগজের বুক কালো কালিতে এঁকে চলেছি। এভাবেই প্রায় আড়াই বছরে তারবিয়াতুস সালিকের তিন অধ্যায় পর্যন্ত অনুবাদ করার সুযোগ দয়াময় এই অযোগ্যকে দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্। এই জটিল ও দুঃসাধ্য কাজের মধ্যে ভালো ও প্রশংসাযোগ্য কিছু হয়ে থাকলে বুঝতে হবে সেটা সম্পূর্ণই আল্লাহ্র রহমত ও আমার মুর্শিদের দোয়ার বরকত। ত্রুটি বিচ্যুতির সম্পূর্ণ দায় এই অধমের।

তাসাওউফ এর অতীত ও বর্তমান

তাসাওউফ হল এসলাহে নফসের উদ্দেশ্যে ইলমী ও আমলী তারবিয়াত– পরিশুদ্ধি। দিলের মধ্যে সৎ স্বভাবের প্রতিষ্ঠা ও অসৎ স্বভাব (রাযায়েল) ও শাহাওয়াতের (কু-প্রবৃত্তির) মুলোৎপাটন। ইসলামী শরীয়তের আনুগত্য, সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্টি, প্রতিকূল অবস্থায় সবর ও ধৈর্য্যের প্রতি নিজেকে প্রশিক্ষিত করে তোলা।

তাসাওউফ বলা হয় নফসের হারাম কামনার বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, প্রতিনিয়ত নফ্‌সকে জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় তুলে তার করনীয় বর্জনীয় কার্যাবলীর হিসাব নিতে থাকা, কলবকে গাফলাতের সকল ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা, আল্লাহ্‌র পথে সকল বাধা অতিক্রম করা। ঐ সকল ভাব, ভালোবাসা ও ভাবনা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা যেগুলো আল্লাহ্‌র যিকির থেকে গাফেল রাখে এবং অন্তরকে দখল করে রাখে। (স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, সম্পদ ইত্যাদি)

অল্পকথায় তাসাওউফের ব্যাখা দিয়েছেন আবু মুহাম্মদ আল জারিরি রহ. এভাবে– 'তাসাওউফ হল সকল উত্তম স্বভাব গ্রহণ এবং নিকৃষ্ট স্বভাব বর্জন'। তিনি আরো বলেছেন– 'সেটা হল সকল অবস্থার প্রতি তিক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া) এবং আদব রক্ষা করা।'

তাসাওউফপন্থীদের আদব সম্পর্কে আবূ নছর রহ. বলেন- কলবকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করণ, আসরার ও রহস্যের রেয়াতকরণ, আল্লাহ্‌ ও বান্দার মধ্যকার অঙ্গীকারসমূহ পালন ও সময়ের সৎ ব্যবহার ইত্যাদি।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলোর আলোকে বলা যায়, তাসাওউফ হল ইসলামী শরীয়তের প্রাণ ও দীনের নির্যাস।

কোনো কোনো সূফী বলেছেন– 'ইলমে শরীয়ত (বা ফিকহ) ছাড়া ইলমে মারেফাত (বা হাকীকত) বাতিল আর হাকীকত ছাড়া ইলমে শরীয়ত অকর্মা। সুতরাং একজন মুসলিমের জন্য শরীয়ত ও হাকীকত হল একটি পাখির দুটি ডানার সমতুল্য। যার একটি ছাড়াও পাখির জীবন মূল্যহীন।

এই ছিল বিদআত ও অজ্ঞতা বর্জিত, বক্রতা ও ত্রুটিমুক্ত তাসাওউফ। ভেজালমুক্ত, শরীয়াত ও মারেফাতের সমন্বয়কারী জগৎ বিখ্যাত কয়েকজন তাসাওউফের ইমাম হলেন–

১। হযরত হাসান বসরী রহ. (মৃত ১১০ হি.)
২। ইবরাহীম বিন আদহাম রহ. (মৃত ১১৬ হি.)
৩। মা'রুফ আল কারখী রহ. (মৃত ২০১ হি.)
৪। বিশর আল হাফী রহ. (মৃত ২২৭ হি.)
৫। যিন্নুন মিছরী রহ. (মৃত ২৪৫ হি.)
৬। সারী সাকতী রহ. (মৃত ২৫৭ হি.)
৭। জুনাইদ বাগদাদী রহ. (২৯৭ হি.)
৮। ইমাম গাযযালী রহ. (মৃত ৫০৫ হি.)
৯। আব্দুল কাদের জিলানী রহ. (মৃত ৫৬১ হি.)

তারাই ছিলেন আমাদের মহান আকাবির ও অনুস্মরণীয় পূর্বসূরী। উক্ত আকাবির উলামা মাশায়েখদের যুগে হক্কানি পীরের জন্য অপরিহার্য শর্ত ছিল দুটি।

এক– মুরীদদের যোগ্যতা ও মেজাজের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের পূর্ণ দক্ষতা।

দুই– শানে এরশাদ ও তারবিয়াত (প্রভাবসৃষ্টিকারী বয়ান-বক্তব্য ও অন্তরের রোগ-ব্যাধি সংশোধনের বিশেষ যোগ্যতা) পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান থাকা। শানে এরশাদের বিচারে যেই পীর আপন যুগের অন্য পীরদের শীর্ষে থাকেন তাকে বলা 'কুতুবুল এরশাদ'। যেমন

হযরত জুনায়েদ বাদাদাদী রহ. এবং হরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. প্রমূখ।[১]

তারবিয়াতের ব্যাপারে পীরের করণীয় বিষয়ে পড়ুন মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রহ. এর বক্তব্য। তিনি آداب الشيخ والمريد গ্রন্থে লিখেছেন-

فلابد أن يكون عند الشيخ دين الأنبياء و تدبير الأطباء و سياسة الملو و حينئذ يقال له الاستاذ. و يجب على الشيخ أن لايقبل مريدا حتي يختبره.

অর্থ- শায়েখ বা পীরের জন্য অপরিহার্য এই যে, তার কাছে থাকবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দীন, চিকৎসকদের তাদবীর এবং রাজা-বাদশাহের কৌশল। এসবের সমন্বয় ঘটলেই কেবল তাকে আখ্যায়িত করা হবে তারবিয়াতের উস্তায বলে। শায়েখ ও উস্তাদের অপরিহার্য কর্তব্য হল– পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া কাউকে মুরীদ হিসেবে কবুল না করা।

উপরোক্ত ইবারাত থেকে বোঝা যায় যে, আকাবিরদের মাকসূদ ছিল এছলাহে নফ্স, এখলাছের সঙ্গে শরীয়তের মামূরাত (নির্দেশ) পালন এবং মানহিয়াত (নিষেধ) বর্জন। আরও বোঝা যায় পীর ও মুরীদের সম্পর্ক হল রোগী ও চিকৎসকতুল্য। ইবরাহীম দাসূকী রহ. এর মন্তব্য দেখুন–

لو ان الفقيه أتى العبادة والمأمورات الشرعية بغير علة كما أمره الله تعالى استغنى عن الشيخ ولكنه أتى العبادات بعلل و امراض فلذلك احتاج إلى طبيب يداويه حتى يحصل له الشفاء.

অর্থ- ফকীহ (শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অবগত আলেম) যদি আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশমতো যথার্থরূপে ইবাদত ও শরীয়তের অন্যান্য নির্দেশ পালনে মশগুল থাকতে পারতেন নির্ভুলভাবে

১. তাসাওউফ এর অতীত ও বর্তমান শিরোনাম থেকে এ পর্যন্ত 'রিসালাতুল মুস্তারশিদীন' লেখক আল হারিস আল মুহাসিবী রহ. তাহকীক ও তা'লীক শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. এর ২৪,২৫,২৬ ও ২৭ পৃষ্ঠা থেকে কিছুটা সংক্ষেপিত।

তাহলে তার কোন পীরের প্রয়োজন হত না। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, তিনি ইবাদতে মশগুল হলেও থেকে যায় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অনেক রোগ-ব্যাধি। সে কারণে তারও প্রয়োজন পড়ে এমন চিকিৎসকের (পীরের) যিনি তার এলাজ করবেন আমরায থেকে পূর্ণ শিফা হাসিল হওয়া পর্যন্ত।

আকাবিরদের যুগে এসলাহ ও আত্মশুদ্ধি ছিল একটি স্বতন্ত্র বিষয়। তখন শায়েখ ও পীর হওয়া কেবল তখনই স্বীকৃত হত যখন তিনি ইবাদতের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অন্তরের রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে এবং ঐসবের এলাজ ও ব্যবস্থাদির সকল পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ দক্ষ হতেন এবং মুরীদগণকে ঐসকল বিষয়ে তালীম দিতেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মুরীদদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দিতেন না। এই ছিল আকাবিরদের পীর-মুরীদির ধরণ।

এরপর ধীরে ধীরে অবস্থা এরূপ পাল্টে যায় যে, এসলাহের বিষয়টি প্রায় নিষ্প্রাণ ও নির্জীব হয়ে পড়ে। অন্য সকলের কথা বাদ দিলেও খোদ মুর্শিদগণও এ বিষয়ের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়েন। চিকিৎসক নিজেই অসুস্থ হলে বা নিয়মমতো চিকিৎসা না দিলে রুগীর সুস্থ হওয়ার আর কী আশা থাকে? এখন হক্কানী পীর হিসেবে পরিচিতদের মধ্যেও এরশাদ ও তারবিয়াত শুধু যিকির ও শোগলের তালীমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পীর মাশায়েখগণ ঐ তালীমকেই নিজেদের কর্তব্য স্থির করে নিয়েছেন। আর মুরীদগণও ঐটুকুর পাবন্দি করাকে এবং উহাকে কারণে সৃষ্ট কিছু কাইফিয়াত ও আহওয়ালকেই মনে করে নিয়েছেন যে, 'ওসূল ইলাল্লাহ্ হয়ে গেছে' অর্থাৎ আল্লাহ্কে পেয়ে গেছেন। যদিও অন্তর রয়ে গেছে কিবির, হাসাদ, রিয়া ইত্যাদি আখলাকে মাযমূমায় আচ্ছন্ন।

এসলাহ ও তারবিয়াতের পুনরুজ্জীবন

আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন রীতি এই যে, পরিত্যাক্ত কোন ধারায়

পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, উলামা ও মুজাদ্দিদীনকে। তাঁর সেই ধারাতেই হিজরী চতুর্দশ শতকেও নির্বাচন করেছেন উলামা মাশায়েখকে। যাদের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মুহউিস সুন্নাহ, কামিউল বিদআহ্ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. ছিলেন নিসন্দেহে উক্ত শতাব্দির মুজাদ্দিদ, সময়ের গাযযালী এবং উম্মতের রূহানী চিকিৎসক হাকীমুল উম্মত। তাঁর এরশাদ ও তারবিয়াত ছিল মাশায়েখে মুতাকাদ্দিমীনের সমতুল্য। বহুযুগ পর তাসাওউফের অস্পষ্ট হাকীকতের এমন স্পষ্ট ও বিশদ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন যাতে হাকীকত অনুধাবনে আর কোন অস্পষ্টতা অবশিষ্ট রয় নি। আমরা জোড়ালো ভাষায় ঘোষণা করতে পারি, যে কেউ চাইলে হযরতের বিভিন্ন কিতাব বিশেষত 'তারবিয়াতুস সালিক' পড়ে কথাটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। হযরতের প্রায় সকল কিতাবে তাসাওউফ বিষয়টি থাকলেও তারবিয়াতের অমূল্য মণি মুক্তার বহু ভাণ্ডার। আজ পর্যন্ত 'তারবিয়াত' বিষয়ে এমন কোন কিতাব রচিত হয় নি যেখানে তার উসূল, ফুরূ' অর্থাৎ তারবিয়াতের সকল মৌলিক ধারা ও উপধারা বিশদভাবে আলোচিত। সালিকদের সামনে আগত সকল হালতের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে চমৎকারভাবে। সেই সাথে সেগুলো সম্পর্কে হযরতের সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ পাঠককে করবে বিস্ময়ে অভিভূত। এমনিভাবে এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে আ'মাল ও হালাত সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরের মানুষের অসংখ্য প্রশ্ন এবং হযরতের জবাবের বিশাল ভাণ্ডার। যেগুলো মনোযোগের সঙ্গে পড়লে এই বিষয়ের সঙ্গে সমঝদার ব্যক্তিবর্গের মুনাসাবাত তৈরি হতে পারে। তারা লাভ করতে পারেন এর হাকীকত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। উপরন্তু এখানে পাওয়া যাবে বহুধরনের সামায়েল, প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা আর হযরতের অসাধারণ জ্ঞানদীপ্ত তাহকীক, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও জবাব। যেগুলো কমবেশি প্রত্যেক

ব্যক্তির যাপিত জীবনের সঙ্গে মিলে যাবে। এবং যেগুলো পড়ে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই ফায়সালা দেবেন তার অবস্থা ভালো না মন্দ, সুস্থ না অসুস্থ। কিতাবটিতে রয়েছে মোট নয়টি অধ্যায়। শুরুতে হযরতের নিজের লেখা একটি ছোট্ট ভূমিকা এবং মূল কিতাব ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু প্রারম্ভিক কথা, যেমন তরীকতের হাকীকত, হুকূকে তরীকত, হযরতওয়ালার শানে এরশাদ ও তারবিয়াতের বৈশিষ্ট্য এবং এমনি ধরণের জরুরী আলোচনা। পাঠকের সুবিধার্তে কিতাবের মোট নয়টি অধ্যায়ের বিবরণ নিচে দেয়া হল–

১ম অধ্যায়- বাইআত ও শায়খের সোহবত
২য় অধ্যায়- আখালাকে হামীদা
৩য় অধ্যায়- আখলাকে রাযীলা
৪র্থ অধ্যায়- আ'মালের বর্ণনা
৫ম অধ্যায়- আহওয়ালের বর্ণনা
৬ষ্ঠ অধ্যায়- যিকির ও শোগলের বিবরণ
৭ম অধ্যায়- স্বপ্ন ও কাশফ সম্পর্কে
৮ম অধ্যায়- ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে
৯ম অধ্যায়- বিবিধ বিষয় সম্পর্কে

যারা নিজেকে শুদ্ধ করতে চান, অবশ্যই তাদের এ কিতাবটি পড়া উচিত। বিশেষত যেসব উলামায়ে কেরাম কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী জ্ঞানে সুপণ্ডিত হতে চান, হাকীমুল উম্মতের গোটা জীবনের তাহকীক ও মুতালাআ, রিয়াযত ও মুজাহাদা, ইলম ও আমল, হাকায়েক ও মাআরিফের নির্যাস এই কিতাব না পড়া তাদের একেবারেই অনুচিত কাজ হবে। সকল পাঠকের খিদমতে এই দুআ ভিক্ষা চাচ্ছি যে, আল্লাহ্ আরহামুর রাহিমীন যেন এই ভিক্ষুককে কাজটি সম্পূর্ণ করার তাওফিক এনায়েত করেন, আমীন।

বাতিল ও বিদআতপন্থী পীর মাশায়েখ

আরো এক প্রকারের তাসাওউফ যুগ যুগ ধরেই এ-জগতে প্রচলিত। যে সকল সুফি বা পীর-মুরীদ কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত। ফরয, ওয়াজিব পালন করে না, সুন্নতের ধার ধারে না। যাদের আকীদা-বিশ্বাস কুফরী ও শিরক মিশ্রিত। আমাদের এই বাংলাদেশে অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রচলিত ও পরিচিত বেশিরভাগ পীর বাতিল ও বিদআতপন্থী। তাদের কারও কারও এমন বক্তব্য পাওয়া যায় যা কোরআন সুন্নাহ বিরোধী। হযরত হাকীমুল উম্মতের এই গ্রন্থ বাতিল পীরের মুখোশ উম্মোচন করে সত্য সন্ধানীদের জন্য বর্ণনা করেছেন খাঁটি পীরের আলামতসমূহ।

পীর মুরীদির বিরুদ্ধে অপপ্রচার

বাংলাদেশে ব্যাপকহারে বাতিল পীরদের রমরমা ব্যবসা চলছে এবং প্রকাশ্যে সহজ-সরল মসুলমানদের ঈমান ধবংস করা হচ্ছে এ-কথা যেমন সত্য একইভাবে সত্য এ-কথাটিও যে, এখানে বাতিল পীরদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে হক্কানী পীরদের বিরুদ্ধেও বিষোদগার ও অপপ্রচারের আশ্রয় নেওয়া হয়। অথচ ইসলাম সর্বদাই সিরাতে মুস্তাকীম বা ভারসাম্যপূর্ণ পন্থার অনুসরণ করতে বলে। আল কোরআন বলে– অর্থ 'একের (দোষের) বোঝা অন্যের ঘারে চাপানো যাবে না।' তাহলে কেন বাতিল পীরদের বিভ্রান্তির আলোচনার পাশাপাশি হক্কানী পীরদের হক প্রচেষ্টার প্রশংসা করা হয় না? অথচ তারা নিজেদের মুরীদদেরকে কঠোরভাবে দীন ও শরীয়তের হুকুম পালনে, বিদআত উৎখাতে, বিদআতীদের থেকে দূরে রাখার মুজাহাদায় সর্বদা তৎপর থাকেন। নিশ্চয়ই এ-ব্যাপারে তাদের প্রশংসা ও মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

পীর ও ওলীগণ নিষ্পাপ নন

অতীত ও বর্তমানের কোনো পীর বুযুর্গ এমনকি উল্লেখিত জগতবিখ্যাত ওলীগণেরও কেউই মাসুম বা নিষ্পাপ নন। কেউই ভুল-ত্রুটির উর্দ্ধে নন। নিষ্পাপ শুধু কেবল আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাম। এতএব, ওলীদের কোনো ভুল ভ্রান্তি হওয়া 'অসম্ভব' বলে বিশ্বাস করা যাবে না। কারও কোনো ভুল-ত্রুটি জানা গেলে ভুলকেই সঠিক বলে জেদ করা যাবে না। আবার কারও কোনো ভুলের কথা জানা মাত্রই তার শানে কোনো বেআদবীও করা যাবে না। ইসলামের দেওয়া আদবের শিক্ষা ও মুসলমানী আখলাক দ্বারা সংশোধন করতে হবে।

প্রিয় পাঠক,

তারবিয়াতুস সালিক কিতাবটি খুব কঠিন বলে প্রশিদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে পাঠোদ্ধার করাই কঠিন। মর্মোদ্ধার করা আরও কঠিন। কারণ মূলত কিতাবখানি এসলাহী চিঠি ও জবাবের সংকলন। এটা হযরতের স্বতন্ত্র কোনো রচনা নয়। চিঠির লিখকগণ লিখার সময় হযরত থানভী রহ. এর তিক্ষ্ণ মেধার কথা ভেবেই সংক্ষেপে বা ইশারা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। হযরত থানবী রহ.ও একই রকম সংক্ষিপ্ততা ও ইশারার আশ্রয় নিয়েছেন। লেখক ও পাঠকের বোধগম্যতাই আসল উদ্দেশ্য। অন্য কারোর বোঝা না বোঝার বিষয়টি কারোরই উদ্দেশ্য ছিল না। ফলে পরবর্তীদের জন্য যথেষ্ট জটিল হয়ে পড়েছে কিতাবটি।

আমি অনুবাদের কাজ করতে গিয়ে জটিলতার মুখোমুখি হয়ে আশপাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে কোথাও কাউকে খুঁজে পাই নি। কারণ আমার আবাসস্থল কুষ্টিয়াতে, যেখানে লালন ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ পাওয়া গেলেও বিশেষজ্ঞ উলামা পাওয়া যায় না। শেষে আশ্রয় নিয়েছি তাঁর কাছে, যার ইশারা আমার জন্য নির্দেশ

সমতুল্য। তিনি আমার মুর্শিদ, তিনি বলেছেন 'যেখানেই জটিলতা বোধ করবেন দু-রাকাত নামায পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করবেন। আমিও দুআ করছি।' (আল্লাহ্ হুযূরকে ছিহহত ও আফিয়াত দান করুন। আমীন।) হুযূরের সেই বুদ্ধি আর দুআতেই আল্লাহ্‌র মেহেরবাণী হয়েছে। এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছে। অনুবাদকে মূলানুগ করা এবং অল্প লেখাপড়া জানা লোকদের জন্যও বোধগম্য করার চেষ্টা ছিল অধমের মধ্যে সর্বাধিক। উচ্চশিক্ষিত পাঠকদের নিকট সবিনয় আরয, দয়া করে ভাষাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা অন্য যে কোনো অসঙ্গতি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। যে কোনো অসঙ্গতি আমাদের জানালে আমরা উপকৃত হব এবং পরবর্তীতে শুধরে নিতে পারব ইনশাআল্লাহ্।

রাহনুমা প্রকাশনী ইসলামী পুস্তক প্রকাশনার জগতে একটি নতুন নাম। রাহনুমা হাকীমুল উম্মতের আত্মশুদ্ধির এই কিতাব তারবিয়াতুস সালিক দিয়ে শুরু করল তার নব যাত্রা। আরহামুর রাহিমীন আল্লাহ্ এই প্রকাশনা সংস্থাকে কবুল করুন। তার অগ্রগতি হোক এই কামনা করি। মূল কিতাবের মতো অনুবাদকেও আল্লাহ্ তাআলা কবুল ও মকবুল করুন। সকলকেই এর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির তাওফীক দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

বিনীত–

মাসউদুর রহমান
কমলাপুর, কুষ্টিয়া।
মোবাইল ঃ ০১৭২৩-২২১১৪৫

হযরত থানভী রহ. এর ভূমিকা

মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদের পর, আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন- ولكن كونوا ربانيين (কিন্তু তোমরা হয়ে যাও রব্বানী- আল্লাহ্ওয়ালা)। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন 'রব্বানী' সেই ব্যক্তি যিনি বড় বড় বিষয়ের পূর্বে ছোট ছোট বিষয় শিখিয়ে মানুষের তারবিয়াত করেন।

উপরোক্ত তাফসীরের ভিত্তিতে আয়াতটি যোগ্যতা অনুসারে দীনী তারবিয়াতের কাজকে ব্যাধ্যতামূলক নির্দেশ (মামূরবিহী বা জরুরি) বলে প্রমাণ করছে। যেই দীনী তারবিয়াতের বহু ও বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিশেষ এক প্রকার তারবিয়াত ইলম ও আমলসহ প্রায় সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যেতে বসেছে। সেটা হল আত্মার পরিশুদ্ধি ও সংস্কার (তারবিয়াতে বাতেন)। আত্মার স্তর ও অভিব্যক্তিসমূহ (মাকাম ও আহওয়াল) কার্য ও প্রতিক্রিয়াসমূহ (আফআল ও আছার) ভাবাবেগ ও সংশয়সমূহ (ওয়ারেদাত ও খাতরাত) ইত্যাদি সকল অবস্থার আলোকে আত্মার পরিশুদ্ধি, পরিমার্জন, পরিচর্যা ও সংশোধন কার্যক্রম মুসলিম উম্মাহর মাঝ থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিদায় নিয়েছে। অভিজ্ঞতা বলে যে, উপরোক্ত সকল দিক বিবেচনায় রেখে আত্মার পরিচর্যা না করলে আত্মার সংশোধন সম্ভব নয়। ওইগুলোকে বাদ দিয়ে অনেক পীর ও মুরীদ যাকে ইসলাহ মনে করেন সেটা আসলে ইসলাহ নয়, সেটা হালতে মাকসূদা (কাঙ্ক্ষিত অবস্থা)ও নয়।

আলহামদুলিল্লাহ্ মহান দুই শেখ হযরত মাওলানা মুর্শিদুনা আলহাজ্জ হাফেয শাহ্ মুহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ্ থানভী ও মুহাজিরে মক্কী এবং তার প্রধানতম খলিফা হযরত মাওলানা হাফেয আলহাজ্জ রশীদ আহমাদ সাহেব গঙ্গোহী রহমাতুল্লাহি আলাইহিমার বরকতপূর্ণ সোহবতে উপস্থিত থাকা এবং জীবনের সর্বাধিক সময় উভয়ের সঙ্গকে আঁকড়ে ধরে থাকার বদৌলতে

উপরোক্ত পরিচর্যা ও পরিশুদ্ধির (তারবিয়াতের) যে বিশুদ্ধ নীতিমালা শুনেছি এবং বুঝেছি, সেই নীতিমালা নিজের এবং অন্য তালিবদের (মুরীদদের)ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে উদ্ধারকারী, পেরেশানি ও কষ্ট থেকে রক্ষাকারী, প্রকৃত গন্তব্যের দিশা দানকারী এবং আত্মার সুস্থতা ও একাগ্রতা প্রদানকারী সাব্যস্ত হয়েছে। ফলে আমার মনও চেয়েছে এবং পাশাপাশি কতিপয় বুযুর্গদোস্ত আহবাবও উৎসাহ যুগিয়েছেন যে, এই ধরনের যে-সকল চিঠিপত্র আমার কাছে আসে এবং সেগুলোর যে-জবাব পাঠানো হয় সেগুলো প্রকাশ ও প্রচার করা হলে আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও কার্যকর দস্তুরুল আমল তৈরি হয়ে যাবে, সুতরাং সেই লক্ষ্য নিয়েই ১৩২৯ হিজরীতে শুরু করা হয় সেই সংকলনের ধারাবাহিকতা, আল্লাহ্ তাআলার কাছে প্রাণভরে দুআ করছি এবং এর নাম রাখছি 'তারবিয়াতুস সালিক ওয়া তানজিয়াতুল হালিক'। এই সংকলনের প্রশ্ন ও উত্তরগুলোকে প্রশ্ন এবং জবাব শিরোনাম দেয়া হয়েছে। অনেকে নিজেদের বিভিন্ন হাল ও অভিব্যক্তি জানিয়েছেন যেগুলোর উপর মতামত প্রকাশ করা হয়েছে, সেইগুলোকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে হাল ও বিশ্লেষণ শিরোনামে।

সত্য বটে যে, এই সংকলনের বিষয়বস্তুগুলো সুক্ষ্ম এবং সুখপাঠ্য নয় তবে এটাও ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, ডাক্তারী প্রেসক্রিপশনে কোনো জটিল কথা কিংবা জ্ঞানের কোনো গুপ্ত ভাণ্ডার থাকে না এবং তাতে কেউ উল্লাসিতও হয় না। এই সংকলনের সুক্ষ্ম ও জটিল বিষয়গুলোকে স্থানান্তর করা হয়েছে 'ইমদাদুল ফাতাওয়া' গ্রন্থে। আর ইমদাদুল ফাতাওয়ার যে বিষয়গুলো এই সংকলনের উপযোগী, সেগুলোকে এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, পাঠকের সুবিধার জন্য প্রতিটি বিষয়ের শেষে পৃথক শিরোনাম দেওয়া হয়েছে এবং একই বিষয়ের বিভিন্ন চিঠি ও হাল ইত্যাদিকে আলাদা আলাদা করে বর্ণনা করা হয়েছে।

আশরাফ আলী উফিয়া আনহু

সূচীপত্র

তরীকত বা তাসাওউফের হাকীকত

সুলূক বা তাসাওউফের সারমর্ম নিম্নরূপ-..... ৩১
হুকূকে তরীকত (তরীকতপন্থীদের করণীয়)..... ৩৩
পীরে কামেল চেনার উপায়..... ৩৭
শরীয়ত, তরীকত, মা'রেফাত ও হাকীকতের ব্যাখ্যা..... ৩৯
ইলমুল ইয়াকীন, আইনুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীন এর ব্যাখ্যা..... ৪০
মুতাকাদ্দিমীন এবং মুহাক্কিকীন এর সাধনা পদ্ধতির পার্থক্য এবং
মুহাক্কিকগণের পদ্ধতির প্রাধান্য..... ৪০
উপকৃত হওয়ার জন্য পীর ও মুরীদের রুচি অভিন্ন হওয়া শর্ত এবং
হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. এর ব্যতিক্রমী সংশোধনী রুচি..... ৭৪

প্রথম অধ্যায়

পীরের সোহবত ও বাইআতের বর্ণনা

বাইআতের উদ্দেশ্য দীনদারীর সংশোধন..... ৮০
যে পীরের অধিকাংশ মুরীদ বেনামাযী তিনি পীর হবার অযোগ্য..... ৮১
বেলায়াত (অলীত্ব) দান করা পীরের এখতিয়ারে নয়..... ৮১
কবীরা গুনাহের কারণে বাইআত বাতিল হয় না..... ৮১
মুরীদের উচিৎ পীরের নিকট খারাপ অবস্থাও প্রকাশ করা..... ৮১
গুনাহের প্রতি ঘৃণা তৈরি হওয়ার পদ্ধতি সোহবত..... ৮২
মুর্শিদের সঙ্গে দূরত্ব না রেখে উপকৃত হতে হবে..... ৮২
শরীয়ত অমান্যকারী পীরের মুরীদ হওয়া জায়েয নেই..... ৮৪
তাকমীল ও পূর্ণতার আলামত..... ৮৪
বাইআতের (মুরীদ করার) অনুমতি এবং যোগ্যতার শর্ত..... ৮৪
নেসবত একটিই তবে... ..... ৮৫
নেসবত 'সল্‌ব' হয় না..... ৮৬
মুজাহাদা-সাধনা ছাড়াও নেসবত হাসিল হয়..... ৮৬
সাহেবে নেসবত চেনার পদ্ধতি..... ৮৭
সুলূকের চূড়ান্ত পর্যায় প্রাথমিক পর্যায়ের মতো..... ৮৭
'নেসবত' এবং 'রেযা' এর পার্থক্য..... ৮৭
পীরের তাওয়াজ্জুহের প্রভাব..... ৮৮

বেলায়াতের অর্থ..... ৮৮
আমলের এসলাহ করা ওয়াজিব কিন্তু এটা বাইআতের
উপর নির্ভরশীল নয়..... ৮৮
বুযুর্গদের হালত গুরুত্বসহ পাঠ করা শেখের সোহবতের সমতুল্য..... ৯০
শেখের সোহবতের প্রয়োজনীয়তা..... ৯০
পীর মুর্শিদের দানের অর্থ..... ৯২
প্রত্যেক ব্যক্তির তারবিয়াত হয় তার যোগ্যতা অনুসারে..... ৯২
নেককার লোকদের সঙ্গে উঠা-বসা করা উপকারী..... ৯৩
ভয়ের চিকিৎসা এবং তাসাওউরে শেখ..... ৯৩
নিজেই চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণয় করা মুরীদের জন্য অন্যায়..... ৯৪
সিলসিলায়ে এমদাদিয়ার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র..... ৯৫
পীরের অভ্যাসগত আচরণের অনুসরণ..... ৯৫
পীরের সোহবতের আকাঙ্ক্ষা ও পত্র যোগাযোগ সোহবতের মতোই..... ৯৭
মাশায়েখদের প্রতি সূরা ইখলাসের ঈসালে সাওয়াব..... ৯৭
কাউকে দ্রুত মুরীদ করে নেওয়া না নেওয়া পীরের আগ্রহের
উপর নির্ভরশীল..... ৯৮
কোনো হালত না হওয়ার সংবাদও পীরকে জানানো কল্যাণকর..... ৯৯
নিজের শেখ (পীর) সম্পর্কে কী এ'তেক্বাদ রাখা উচিত..... ৯৯
নামাযে ইচ্ছাকৃত পীরের কল্পনা ক্ষতিকর..... ১০০
বাইআত হবার মুনাসিব তরীকা..... ১০০
মুতাআল্লিকীনকে তিরস্কার ও নিন্দা করা মুরব্বির দায়িত্ব..... ১০১
মুরীদের জন্য পীরের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হওয়া জরুরি..... ১০২
মুরীদ না করার কারণে পীরের প্রতি অহঙ্কার ও অসন্তোষের চিকিৎসা..... ১০৩
সংশোধনের উদ্দেশ্যে মুরীদকে বাতেনি রোগ সম্পর্কে সজাগ করা..... ১০৬
নিজের এলেমকে পর্যাপ্ত মনে করা মুরীদের জন্য নিন্দনীয়..... ১১২
পীরের মধ্যে দিব্য শক্তির ধারণা করা পছন্দনীয় নয়..... ১১৩
পীরের মহব্বত সফলতার চাবিকাঠি..... ১১৩
খোদরাঈ (আত্মমত) তরীকতের মধ্যে নিন্দনীয়..... ১১৪
নফসের মুহাসাবা এবং পীরকে অবগতি প্রদান..... ১১৭
পীরের কাছে নিজের অবস্থা জানানো উপকারী..... ১১৭
পীরের মহব্বত তরীকতের মধ্যে খুবই উপকারী..... ১১৭
পীরের খেদমতে হাদিয়া পেশ করা..... ১১৮
পীরের লেবাস-পোশাক দ্বারা বরকত লাভ করা..... ১১৮
অযীফা সহজ করার আবেদন বাহুল্য ব্যাপার..... ১১৯

পীরের প্রতি সুধারণা পোষণ উপকারী..... ১২০
ইত্তেবায়ে শেখের আবশ্যকতা..... ১২০
পীরের তাওয়াজ্জুহ মানে কী..... ১২১
তরীকতের উসূল (রীতি-নীতি) জানার উদ্দেশ্য..... ১২১
উদ্দেশ্য বুঝার আগেই বাইআত হওয়া উচিৎ নয়..... ১২১
পীরের কাছাকাছি থাকা এবং দূরে থাকার মধ্যে ব্যবধান..... ১২৩
ইত্তেবায়ে শেখের অর্থ ও উদ্দেশ্য..... ১২৩
আবদিয়াতের আলামত ও সুন্নতের বিস্তৃতি..... ১২৪
পীরের সঙ্গে রূহানী নৈকট্যের সুরতহাল..... ১২৬
কাজ কম হলেও পীরের সোহবত উপকারী..... ১২৬
সফলতার পূর্বাভাস..... ১২৭
পীরের মৃত্যুর পর অন্য পীরের মুরীদ হওয়া..... ১৩০
পীরের কাছে এমন কোনো আবেদন করা অনুচিত যার
মাধ্যমে নিজের রায় প্রকাশ পায়..... ১৩৫
আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক শুরু হওয়ার লক্ষণ..... ১৩৫
সোহবতের বারাকাত..... ১৩৬
বাইআতের (মুরীদ করার) অনুমতি..... ১৩৭
চিঠির অনুরোধে পীরকে সালাম না জানানো অপরাধ নয়..... ১৩৯
নিজেই লাভ-ক্ষতির প্রস্তাব করা মুরীদের জন্য বেয়াদবী..... ১৩৯
মুনাসাবাত ছাড়া বাইআত উপকারী নয়..... ১৩৯
কোনো বিশেষ অযীফা বা শোগলের আবেদন করা বেয়াদবী..... ১৪১
পীরের মহব্বত..... ১৪১
পীরের জরুরত এবং তাঁর কাছে অবস্থানের শর্ত..... ১৪২
তরীকতের মধ্যে নিজেকে সমর্পিত করে দেওয়া প্রধান শর্ত..... ১৪৫
নিসবত ইলক্বা করার পদ্ধতি..... ১৪৬
শয়তান কর্তৃক পীরের আকৃতি ধারণ না করা সর্বক্ষেত্রে
নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রের ব্যাপার..... ১৪৬
পীরের ভালোবাসার মাধ্যম রাসূলের ভালোবাসা..... ১৪৭
রিসালা আলইয়াম্ম ফিস্‌সাম্ম (তাসাওউফ মহাসিন্ধু এক বিন্দুতে)..... ১৪৮
আল্লাহ্‌, রাসূল এবং পীরের ভালোবাসার জন্য দুআ..... ১৪৮
আত্মশুদ্ধির মহাসাগর সুঁইয়ের ছিদ্রে..... ১৪৯
আমলের ইসলাহ বাইআত, যিকির ও শোগলের চেয়ে অধিক জরুরি..... ১৪৯
হালত জানানোর এবং পীরের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা..... ১৪৯
একজন খলিফার নিজেকে দীনের খিদমত থেকে সরিয়ে নেয়া..... ১৫৬

পীরের ইজাযত ছাড়াই তা'লীমের অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া..... ১৫৬
ইজাযত প্রাপ্তির (খলিফা হওয়ার) শর্ত..... ১৫৭
পীরের সোহবতে থাকা জরুরি..... ১৫৮
মুরীদের রায় ও মত প্রদানের অধিকার নেই..... ১৫৯
পীর ছাড়া অন্য কাউকে মা'মূলাত-এর কথা জানানো যাবে না..... ১৬০
পীরকে অন্যের মাধ্যমে সংবাদ পৌঁছানো উচিৎ নয়..... ১৬১
পীরের বৈঠকখানার দিকে থুথু না ফেলা..... ১৬২
পীরকে হাদিয়া প্রদানের শর্ত..... ১৬২
মুনাসাবাত ও সার্বিক মিলের পর বাইআত করা..... ১৬৪
পীর ও মুরীদের মধ্যে মুনাসাবাত জরুরি..... ১৬৪
নতুন করে বাইআত..... ১৬৬
মুরীদ করতে আখলাক জানতে হবে তালীম করতে নয়..... ১৬৬
পীরের কাছে থাকতে হলে শর্ত..... ১৬৭
মুরীদ করার পূর্বশর্ত যোগ্যতা..... ১৬৮
মুরীদ হওয়ার আবশ্যকতা..... ১৬৮
পীরের সঙ্গে মিল না হওয়ার আলামত..... ১৬৯
পীরকে ভালোবাসা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার আলামত..... ১৭০
পীরের প্রতি মহব্বত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
প্রতি মহব্বত সৌভাগ্যের চাবিকাঠি..... ১৭১
পীরের মহব্বত..... ১৭১
পীরের প্রত্যেক মন্দ প্রভাব মুরীদের উপর হবে না..... ১৭৬
পীর থেকে উপকৃত হওয়ার শর্ত..... ১৭৭
বাইআতের মধ্যে তাড়াহুড়া না করা উচিৎ..... ১৭৭
অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি অন্যকে মুরীদ করার নিষেধাজ্ঞা..... ১৭৮
পীরের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠানো মাহরূম হওয়ার কারণ..... ১৮০
পীরের সোহবত ও লিখিত নির্দেশনার (তালীমের) উপকারিতা..... ১৮০
শরীয়ত বিরোধী কারো হাতে বাইআতের শপথ করলে
ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব..... ১৮২
বাইআত ভাঙ্গার তরীকা..... ১৮২
তারবিয়তের পন্থা বহু ও বিভিন্ন..... ১৮২
পীরের ধমকী ও তিরস্কার..... ১৮৪
রুহানী চিকিৎসা একই পীরের নিকট করানো উচিৎ..... ১৮৫
আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তি বাইআতের উপর নির্ভরশীল নয়..... ১৮৬
মুরীদ হওয়ার শর্তসমূহ..... ১৮৭

ইসলাহে বাতেনের জন্য পীরের জরুরত..... ১৮৮
ইসলাহে নফসের জন্য পীরে কামেলের আবশ্যকতা..... ১৯১
পীরের সঙ্গে মুনাসাবাত তৈরি হওয়ার পন্থা..... ১৯১
পীরের সোহবতের প্রয়োজনীয়তা..... ১৯৩
বিনা চেষ্টায় কলবের উপর পীরের আকৃতি ফুটে উঠা নেয়ামত..... ১৯৫
নিসবতে বাতেনিয়্যার সূচনা..... ১৯৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

আখলাকে হামীদার বর্ণনা

নির্জনতা, ভ্রমণ এবং তাওয়াক্কুল ও তাদবীর..... ১৯৬
আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বত লাভের এবং গায়রুল্লাহর
মহব্বত দূর করার পন্থা..... ১৯৭
খুশূ' তৈরি হওয়ার পন্থা..... ১৯৭
মহব্বতের আলামত..... ১৯৮
আল্লাহ্র ভালোবাসা এবং পীরের ভালোোবাসা প্রবল হওয়া..... ২০০
আলামাতে আবদিয়াত বা দাসত্তের চিহ্ন..... ২০২
মহব্বত ও আবদিয়াতের লক্ষণ..... ২০৩
তাওয়াক্কুল..... ২১০
হযরত থানভী রহ. এর একজন খলিফার চিঠি..... ২১৪
তওবার তাওফীক পাওয়া সফলতার লক্ষণ..... ২১৮
যিকিরের মধ্যে উন্নতি করা..... ২১৮
রিযায়ে হক হাসিল করার পন্থা..... ২১৮
আসল মাকসাদ তাআল্লুক মাআল্লাহ্ বৃদ্ধি পাওয়া..... ২১৯
তাওহীদের গালাবা বা প্রাধান্য..... ২১৯
আবদিয়াত ও নুযূল কামেলের আলামত..... ২২১
সদাচরণের উদ্দেশ্য..... ২২২
সত্য উপলব্ধির আলামত..... ২২২
খাশ্য়াতের আছর..... ২২৩
তাফবীয ও তাওয়াক্কুলের গালাবা..... ২২৪
তাআল্লুক মাআল্লাহ্র সামনে লতীফা– নূর এসবের কোনো মূল্য নেই..... ২২৫
কলবী ইসলাহ..... ২২৫
বিনয় ও কৃতজ্ঞতার প্রাধান্য..... ২২৬
যুহদ ও দুনিয়া বিমূখতার লক্ষণ..... ২২৭
আক্বলী খাওফ (মানসিক ভীতি) এর জরুরত..... ২২৭

দুআ বা দাওয়া রেযা বিল কাযা এর বিপরীত নয়..... ২২৮
দূরত্বের আকৃতিতে নৈকট্য..... ২৩০
আল্লাহ্‌র ভালোবাসা ও রাসূলের ভালোবাসায় যুগলবদ্ধতা..... ২৩১
বিনয়ের প্রাবল্য, রহমতের প্রশস্ততা ও আল্লাহ্‌র মহত্ব..... ২৩১
যথার্থ তওবার আলামত..... ২৩২
আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার হাকীকত..... ২৩২
আখিরাতের ভয় কাঙ্ক্ষিত..... ২৩৩
ইসলাহে বাতেন যেটুকু ফরয..... ২৩৩
তরীকতের মূল লক্ষ্য 'নিসবত' সম্পর্কে বিশ্লেষণ..... ২৩৪
আল্লাহ্‌র জন্য প্রবল ক্রোধ..... ২৪১
বিনয় অন্যতম ঈমানী গুণ..... ২৪১
হুযূর ও খুলূছের (একাগ্রতা ও নিষ্ঠার) বিভিন্ন স্তর..... ২৪১
মহব্বতের বিভিন্ন রঙ ও ধরণ..... ২৪২
নিসবতের বিভিন্ন প্রকার..... ২৪২
আদবের জয় ও প্রাধান্য..... ২৪৩
তাওয়াযু' ও বিনয়ের আছর সমূহ..... ২৪৪
তওবার আবশ্যকতা..... ২৪৫
রিযা বিল কাযা..... ২৪৫
নেয়ামতের শুকরিয়া..... ২৪৬
আল্লাহ্‌ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের ক্রমবিন্যাস...২৪৬
নির্জনতার লাভ..... ২৪৬
আদব এবং তাকাল্লুফের পার্থক্য..... ২৪৭
তওবা কবূল না হওয়ার বিশ্বাস নিন্দনীয়..... ২৪৭
খাশ্‌য়াতের আছর..... ২৪৮
ইশ্‌কে ইলাহীর পথ..... ২৪৮
আল্লাহ্‌কে ভালোবাসা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
ভালোবাসা উভয়টি পরস্পর সংযুক্ত..... ২৫১
বিনয় ও তাওয়াযু'র আছর..... ২৫২
আল্লাহ্‌র জন্য দোস্তি ও তাঁরই জন্য দুশমনীর প্রাধান্য..... ২৫৪
আবদিয়াত আসল মাকসূদ..... ২৫৪
ভারসাম্য প্রয়োজন..... ২৫৭
আল্লাহ্‌র জন্য প্রেম আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেম হিসাবে বিবেচিত..... ২৫৭
তাওহীদ, ফানা ও আবদিয়াতের প্রাবল্য..... ২৫৮
একাগ্রতা ও মহব্বত অর্জনের পন্থা..... ২৮০

রিয়া বিল কাযা..... ২৮০
আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার উপায়সমূহ..... ২৮২
আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াজ্জুহ অর্জনের পন্থা..... ২৮২
হায়া ও লজ্জাশীলতার প্রভাব..... ২৮২
খুশূ' এর হাকীকত..... ২৮২
আল্লাহ্‌র জন্য দুশমনির প্রভাব..... ২৮৩
আল্লাহ্‌র মহব্বত অর্জনের উপকরণ..... ২৮৪
খুশূ' ও খুলূছ অর্জনের পন্থা..... ২৮৫
শোকরের হাকীকত..... ২৮৬
শোকর অর্জনের পন্থা..... ২৮৬
যোহদ অর্জনের পদ্ধতি..... ২৮৬
সততা ও ইখলাসের হাকীকত এবং অর্জনের তরীকা..... ২৮৭
ইখলাস এবং খূশূ' খুযূ'র মধ্যে পার্থক্য..... ২৮৭
রিয়া বিল কাযার হাকীকত ও অর্জনের পদ্ধতি..... ২৮৯
মুস্তাহাব তাওয়াক্কুল হাসিলের তরীকা..... ২৯০
সবরের হাকীকত এবং বিশদ ব্যাখ্যা..... ২৯০
আবদিয়াত ও দাসত্বে প্রভাব..... ২৯১
ইশকের উপর হুব্বে আকলীর ফযীলত বিশ্লেষণ..... ২৯২

তৃতীয় অধ্যায়

আখলাকে রাযীলার বর্ণনা

গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় হিম্মত ও ইস্তিগফার..... ২৯৪
বেশি কথা বলার চিকিৎসা..... ২৯৪
গীবত ও অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকার পন্থা..... ২৯৪
সাহসহীনতার চিকিৎসা সাহস..... ২৯৪
হারাম দৃষ্টির প্রতিকার..... ২৯৬
গর্ব ও অহংকারের এলাজ..... ৩০৮
আনন্দ ও প্রশান্তি উজব নয়..... ৩০৯
ইশ্‌ক এর এলাজ..... ৩০৯
অধিক কথা বলার এলাজ..... ৩১১
তওবা ভঙ্গের এলাজ..... ৩১১
নাজায়েয ইশকের এলাজ..... ৩১২
রিয়া বা লোক দেখানির এলাজ..... ৩২০
রিয়া বা লোক দেখানোর হাকীকত..... ৩২১

দ্রুত রেগে যাওয়ার এলাজ..... ৩২৩
ক্রোধের এলাজ..... ৩২৪
আমরোদ পূজা এবং ফারায়েয ত্যাগের এলাজ..... ৩২৮
তোষামোদ নিষিদ্ধ..... ৩৩০
আমল ছুটে যাওয়ার কারণে রাগ..... ৩৩১
শাহওয়াতের এলাজ..... ৩৩১
অপ্রয়োজনীয় সম্পর্ক বর্জনের তাদবীর..... ৩৩১
সম্পদের মোহ ও এলাজ..... ৩৩২
বিনা প্রয়োজনে নামের শেষে নিসবত লেখা নিন্দনীয়..... ৩৩৩
ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করার ফযীলত..... ৩৩৩
গুনাহকে ক্ষতিকর না মনে করা শয়তানি চক্রান্ত..... ৩৩৪
অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবি ব্যস্ততার এলাজ..... ৩৩৪
গুনাহের ওয়াস্ওয়াসার এলাজ এবং নফসের মুহাসাবা..... ৩৩৫
হুব্বে দুনিয়ার এলাজ..... ৩৩৬
সন্দেহযুক্ত মাল থেকে দূরে থাকা..... ৩৩৬
অনর্থক কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকা..... ৩৩৭
কথার কর্কষতার এলাজ..... ৩৩৭
রিয়া এখতিয়ারী বিষয়..... ৩৩৭
মুক্তাদীগণের রেয়াত করা রিয়া নয়, রিয়ার বিভিন্ন অবস্থাকে এর
উপর কিয়াস করা সহীহ নয়..... ৩৩৮
রিয়ার অশঙ্কা থেকে বাঁচা জরুরি নয়..... ৩৪০
তাকাব্বুর এর হাকীকত..... ৩৪০
রাগের হালতে কোনো পাপীকে ঘৃণিত ভাবার এলাজ..... ৩৪৩
সৌন্দর্য পূজার এলাজ..... ৩৪৩
অন্যের ত্রুটি খোঁজার এলাজ..... ৩৪৪
মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ বিরাট নেয়ামত..... ৩৪৪
কথা ঘোরানো ব্যাখ্যা দাঁড় করা তালিবের জন্য বিশেষ ক্ষতিকর..... ৩৪৫
ভুল স্বীকার না করার এলাজ..... ৩৪৬
ইনসান সকল দোষ-ত্রুটির প্রতি আকলী ঘৃণার মুকাল্লাফ..... ৩৪৭
গুনাহের প্রতি আগ্রহ, ইবাদাতে অলসতা এবং বুযুর্গদের
প্রতি খারাপ ধারণার এলাজ..... ৩৪৭
গায়রুল্লাহ্র মহব্বতের এলাজ..... ৩৪৮
গর্ব, অহঙ্কার ও রিয়ার এলাজ..... ৩৪৯
যেই ক্রোধ দোষণীয় নয়..... ৩৪৯

রিয়ার হাকীকত এবং নির্মূলের উপায়..... ৩৫১
উজব, হাসাদ ইত্যাদির এলাজ..... ৩৫২
আত্মগর্ব ও অহঙ্কারের এলাজ..... ৩৫৩
ক্ষতিকর সোহবত থেকে দূরে থাকা..... ৩৫৫
নফসের কৃপণতার এলাজ..... ৩৫৬
গীবত, অনর্থক কথা, কিবির ও লোভের এলাজ..... ৩৫৬
খাদ্যের লিপ্সা ও উজবের এলাজ..... ৩৫৮
ইশ্‌কে মাজাযী ইশ্‌কে হাকীকীর সেতু..... ৩৫৯
আজনবী নারীর প্রতি ইশকের এলাজ..... ৩৫৯
নিজেকে ভালো ও অন্যকে মন্দ ভাবার এলাজ..... ৩৬৪
ইলমী ও আমলী উজবের এলাজ..... ৩৬৫
গীবতের এলাজ..... ৩৬৫
উজব এর এলাজ..... ৩৬৮
আখলাকে রাযীলা মাগলূব হয় নির্মুলও হতে পারে..... ৩৬৯
কিবিরের এলাজ..... ৩৭২
রিয়া এর এলাজ..... ৩৭৮
বালকদের প্রতি মহব্বত নিন্দনীয়..... ৩৭৯
কিবিরের আলামত..... ৩৮০
কিবির, গযব ও গীবতের এলাজ..... ৩৮০
হুব্বে দুনিয়ার এলাজ..... ৩৮১
নফসের তাকাযা থেকে বাঁচার এলাজ..... ৩৮২
নফসের ঔদ্ধত্যের আলামত..... ৩৮২
শাহ্‌ওয়াত পূজার এলাজ..... ৩৮৩
এখতিয়ারী গুনাহের এলাজ..... ৩৮৪
রিয়ার চিহ্ন..... ৩৮৫
ফুযূল কথা বলার এলাজ..... ৩৮৫
ইচ্ছা ছাড়া রিয়া হয় না..... ৩৮৫
মন্দ মজলিস থেকে দূরে থাকা..... ৩৮৬
অনর্থক প্রশ্ন থেকে বিরত থাকা..... ৩৮৬
আমরোদের প্রতি মহব্বতের এলাজ..... ৩৮৭
কিবির, হাসাদ ও আরো বাতেনি আমরাযের এলাজ..... ৩৯৩
হুব্বেজাহ এর এলাজ..... ৩৯৪
নফ্‌সানী দৃষ্টিতে শিশু-বালকদেরকে দেখাও গুনাহ্..... ৪০১
গীবতের এলাজ..... ৪০১

হাসাদ, রিয়া ও উজবের এলাজ..... ৪০৬
যিনা ও লেওয়াতাতের এলাজ..... ৪০৮
লোভ ও লালসার এলাজ..... ৪০৯
উজবের এলাজ..... ৪১০
নযরে বদ এর ওয়াস্ওয়াসার এলাজ..... ৪১৩
সৌন্দর্য পূজার এলাজ..... ৪১৪
ফুযূল ও অনর্থক কথা বলার এলাজ..... ৪১৭
হাসাদ ও হিংসার এলাজ..... ৪১৮
'কীনা' এর এলাজ..... ৪১৯
বুখল ও বখিলির এলাজ..... ৪২০
কিবিরের এলাজ..... ৪২০
বদ যবানীর এলাজ..... ৪২৯
কয়েকটি কারণে যৌন চাহিদার প্রভাব বার্ধক্যে বৃদ্ধি হয়..... ৪৩০
অকল্যাণ চিন্তার এলাজ..... ৪৩০
বেহুদা কাজ বর্জন আবশ্যক..... ৪৩০
গোস্সা বা রাগের এলাজ..... ৪৩১
রিয়ার ওয়াসওয়াসার এলাজ..... ৪৩৯
খাহেশে নফ্সানীর প্রবল হয়ে উঠার এলাজ..... ৪৪১
মন্দ ধারণার এলাজ..... ৪৪৩
ইসরাফ ও অপচয়ের এলাজ..... ৪৪৩
বুখল ও কৃপণতার ওয়াস্ওয়াসার এলাজ..... ৪৪৩
নেয়ামতের না শুকরীর এলাজ..... ৪৪৪
দোষণীয় আখলাকের ইমালা ও ইযালা সম্পর্কে আম্বিয়া ও গায়রে আম্বিয়া
আলাইহিমুস সালামের মাঝে পার্থক্য..... ৪৪৫
খিয়ালী যিনা (কাল্পনিক ব্যাভিচার) এর এলাজ..... ৪৪৫
আখলাক রাযীলার ইমালা হওয়া..... ৪৪৭
প্রত্যেক বাতেনি রোগের এলাজ ইসলাহ পৃথক পৃথক করানো উচিৎ..... ৪৪৮
খোদরাই-র এলাজ..... ৪৪৮
না শোকরীর ওয়াস্ওয়াসার এলাজ..... ৪৪৮
হাসাদ ও গিবতা'র হাকীকত..... ৪৪৯
মনে মনে বা কল্পনায় যিনা করা হারাম ৪৪৯
তাকাব্বুরের আলামত ও তাকাব্বুরের হাকীকত..... ৪৫০
রিয়ার হাকীকত এবং তার এলাজ..... ৪৫২
অহঙ্কারের ওয়াস্ওয়াসার এলাজ..... ৪৫৫

তরীকত বা তাসাওউফের হাকীকত

সুলূক বা তাসাওউফের সারমর্ম নিম্নরূপ-

(১) না তো তাসাওউফের মধ্যে কাশ্‌ফ ও কারামাত জরুরি।

(২) না এখানে কেয়ামতের ময়দানে নাজাত-মুক্তির জিম্মাদারী নেওয়া হয়।

(৩) না দুনিয়াবি কার্যোদ্ধারের অঙ্গীকার করা হয়। যেমন একথা বলা হয় না যে, পীরের তাবিজ-কবচ দিয়ে সব কাজ হয়ে যাবে। মামলা-মোকদ্দমার জিত হয়ে যাবে। উপার্জনের মধ্যে উন্নতি হবে। ঝার-ফুঁক দিয়ে রোগ-বালাই সব দূর হয়ে যাবে। অথবা ভবিষ্যতের কথা জানিয়ে দেওয়া হবে।

(৪) না তো পীরের মধ্যে এমন কোনো রূহানী শক্তি থাকা জরুরি যে তার তাওয়াজ্জুহের মাধ্যমে আপনা আপনি মুরীদের আত্মশুদ্ধি ঘটে যাবে। তার মধ্যে গুনাহ করার কোনো ইচ্ছাই জাগবে না। আপনা আপনিই ইবাদত হতে থাকবে, মুরীদের জোরালো ইচ্ছাও করতে হবে না। অথবা মুরীদ শুধু পীরের তাওয়াজ্জুহের দ্বারা হাফেয, আলেম হয়ে যাবে অথবা তার স্মরণশক্তি বেড়ে যাবে।

(৫) তাসাওউফের মধ্যে না এমন কোনো বাতেনি কাইফিয়ত (মনের অবস্থা) সৃষ্টি হওয়ার অঙ্গীকার আছে যে, সর্বদা অথবা ইবাদতের সময় মুরীদ আনন্দে বিভোর হয়ে থাকবে। ইবাদতের মধ্যে মনে কোনো প্রকার খেয়াল, সংশয় ও ওয়াস্‌ওয়াসাই জাগবে না, খুব কান্না আসবে, এমন আত্মহারা অবস্থা তৈরি হবে যে, অন্য কোনো কিছুই আর মনে থাকবে না।

(৬) না যিকির ও শোগলের সময় নূর ইত্যাদি চোখে পড়া জরুরি, না কোনো গায়েবী আওয়াজ কানে আসা জরুরি।

(৭) না ভালো ভালো স্বপ্ন দেখা, না মনের মধ্যে জেগে উঠা বিভিন্ন বিষয় (এলহাম) সত্য হওয়া জরুরি। তাসাওউফের মধ্যে ঐ বিষয়গুলোর কোনোটাই জরুরি নয় এবং ঐগুলোর কোনোটাই তাসাওউফের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও নয়। আসল মাকসূদ বা মূল উদ্দেশ্য হল মহান আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা, যার উপায় এই যে, শরীয়তের সকল আদেশ ও নিষেধ সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতে হবে। সেই আদেশ-নিষেধের মধ্যে কিছু আছে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি, যেমন বিয়ে, তালাক, স্বামী-স্ত্রীর

হক আদায় করা, কসম, কসমের কাফ্ফারা ইত্যাদি, আরো যেমন লেন-দেন, অনুসরণ, মামলা-মকাদ্দমা, সাক্ষ্য, অসিয়ত, উত্তরাধিকার বণ্টন ইত্যাদি। আরো আছে যেমন সালাম, কথা, খাওয়া, ঘুমানো, দাঁড়ানো, বসা, কারো মেহমান হওয়া এবং মেহমানদারী ইত্যাদি এ-সকল বিষয়ের মাসায়েলকে বলা হয় ইলমে ফেকাহ। আবার শরীয়তের কিছু আদেশ-নিষেধ এমন আছে যেগুলো (জাহেরি অঙ্গের সঙ্গে নয় বরং) অন্তর ও মনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন আল্লাহ্কে ভালোবাসা, আল্লাহ্কে ভয় করা, আল্লাহ্কে স্মরণ রাখা। দুনিয়ার ভালোবাসা কমানো, আল্লাহ্র ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট ও সমর্পিত থাকা, লোভ না করা, ইবাদতের মধ্যে মনোযোগ ও একাগ্রতা সৃষ্টি করা, দীনের সকল কাজ ইখলাসের সঙ্গে অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করা, কাউকে তুচ্ছ মনে না করা, খোদ পছন্দী (অর্থাৎ নিজের সব ভালো এমন মনে না করা), ক্রোধ দমন করা ইত্যাদি। এই আখলাকগুলোকে 'সুলূক' বলা হয়। জাহেরি বা বাহ্যিক আহকামের মতো এই সকল বাতেনি আহকামের উপর আমল করাও ফরয ও ওয়াজিব। তাছাড়া এসব বাতেনি ত্রুটির কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জাহেরি আমলসমূহেও ত্রুটি হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ্র প্রতি মহব্বতে ঘাটতির কারণে নামাযে অবহেলা ও অলসতা তৈরি হয় অথবা নামাযের মধ্যে তাড়াহুড়া হয়ে যায়। অথবা মনের মধ্যে কৃপনতার রোগ থাকলে যাকাত দেওয়া ও হজ্জ পালনের সাহস হয় না। অথবা অহঙ্কার ও সীমাছাড়া ক্রোধ থাকলে অন্যের উপর জুলুম হয়ে যায়, অন্যের হক নষ্ট হয় ইত্যাদি। আর যদি ঐ সব জাহেরি আমলের মধ্যে সাবধানতাও অবলম্বন করা হয় তবুও নফসের এসলাহ ও আত্মার সংশোধন যতদিন না করা হয় ঐ সতর্কতা অল্প কয়েকদিনের বেশি চলতে পারে না। সুতরাং নফসের এসলাহ বা আত্মার সংশোধন ঐ দু-কারণে জরুরি সাব্যস্ত হয়। কিন্তু এসব বাতেনি (অন্তরের) ত্রুটিগুলো বাহির থেকে বোঝা যায় কম। আবার নফসের অনাগ্রহের ফলে জানা গেলেও সে অনুযায়ী আমল করা মুশকিল হয়ে যায়। এজন্যই নির্বাচন করতে হয় কামেল পীর। যিনি ঐ বিষয়গুলো বোঝেন এবং মুরীদকে সাবধান করেন। চিকিৎসা এবং তাদবীর বলে দেন, সঙ্গে সঙ্গে নফসের মধ্যে সুস্থ হবার যোগ্যতা এবং প্রদত্ত চিকিৎসার মধ্যে সহজতা এবং তাদবীরের মধ্যে শক্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কিছু যিকির ও অযীফাও শিক্ষা দেন। যিকির নিজেও একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। অতএব সালেককে দুটি কাজ করতে হয়, একটি জরুরি অন্যটি মুস্তাহাব।

জরুরি কাজটি হল আহকামে শরীয়তের জাহেরি বাতেনি পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ। আর মুস্তাহাব কাজটি হল অধিক পরিমাণে যিকির করা। আহকামে শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের দ্বারা হাসিল হবে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি আর যিকিরের আধিক্য দ্বারা পাওয়া যাবে সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের আধিক্য। এই হল সুলূকের পথ ও এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সারকথা।

হুকূকে তরীকত (তরীকতপন্থীদের করণীয়)

তরীকতে প্রবেশের পর যে কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে সেগুলো হলঃ-

(১) বেহেশতী জেওর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত (১-১১ শ খণ্ড) প্রতিটি বিষয়, প্রতিটি মাসআলা পড়তে বা শুনতে হবে, (অবশ্য মুরীদ না হলেও সাধারণ সকল মুসলমানের জন্যই এটা ওয়াজিব)।

(২) নিজের সকল অবস্থাই বেহশতী জেওরের মতো বানাতে হবে।

(৩) যে কাজ করতে হবে সেটা জায়েয কি নাজায়েয, বৈধ না অবৈধ, সেটা জানা না থাকলে সর্বপ্রথম কোনো হক্কানী আলেমের নিকট থেকে বিনয়ের সঙ্গে জেনে নিতে হবে এরপর তার সিদ্ধান্তের আলোকে আমল করতে হবে।

(৪) পাঁচওয়াক্ত নামায জামাতের সঙ্গে মসজিদে আদায় করতে হবে। (মহিলাদের জন্য জামাতে হাজির হওয়ার নির্দেশ নেই।) শরীয়তের কোনো ওযর থাকলে অবশ্য জামাতের হুকুম মাফ হবে। যদি বিনা ওযরে গাফলত ও অলসতার কারণে জামাত ছুটে যায় তবে অনুশোচনার সঙ্গে তওবা ইস্তেগফার করতে থাকবে।

(৫) যদি নেসাব পরিমান সম্পদের মালিক হয় তবে যাকাত আদায় করতে হবে। এ বিষয়ের মাসায়েল বেহেশতী জেওরে পাওয়া যাবে। এমনিভাবে জমিনের ফসল বা বাগানের ফল ইত্যাদির মধ্যে ওশর (দশভাগের এক ভাগ অথবা বিশভাগের এক ভাগ) আদায় করতে হবে। এ বিষয়ের মাসায়েল মৌখিকভাবে আলেমদের নিকট থেকে জেনে নিতে হবে।

(৬) হজ্জের সঙ্গতি থাকলে হজ্জ আদায় করতে হবে। এমনিভাবে আর্থিক সঙ্গতি থাকলে ঈদের সময় 'সাদাকাতুল ফিতর' এবং ঈদুল আযহায় 'কুরবাণী' দিতে হবে।

(৭) নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের হক আদায় করতে হবে। তাদের একটি দীনী হক এটাও যে, সর্বদা তাদেরকে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ শেখাতে থাকবে। এর সহজ পদ্ধতি শিক্ষিতদের জন্য এই যে, দিন বা রাতের কোনো একটি

সময় নির্ধারণ করে সেই সময় বেহেশতী জেওর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাড়ির লোকদের পড়ে পড়ে শোনাবে এবং বুঝিয়ে দেবে। যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আবার শুরু করবে। যতদিন পর্যন্ত সকল মাসায়েল তাদের খুব ভালোভাবে ইয়াদ (মুখস্ত) না হবে, সব মাসায়েল ভালোভাবে বুঝে না আসবে ততদিন পর্যন্ত এভাবেই চালাতে থাকবে। আর যারা লেখা-পড়া জানে না তারা এভাবে দায়িত্ব পালন করবে যে, দীনের যে কোনো বিষয়ই নির্ভরযোগ্য আলেমদের মুখ থেকে শুনে ভালোভাবে মুখস্থ করে এসে বাড়ির সকলকে শিখিয়ে দেবে।

আর নিচের এই কাজগুলি বর্জন করতে হবে-

(১) দাড়ি কামানো।

(২) দাড়ি ছোট করা অর্থাৎ দাড়ি চার আঙ্গুলের চেয়ে লম্বা হলে (চার আঙ্গুলের) অতিরিক্ত অংশ কাটা বা খাটো করা জায়েয আছে কিন্তু কেটে চার আঙ্গুলের চেয়ে ছোট করে ফেলা জায়েয নেই।

(৩) দাড়ি নিচ থেকে উপড়ের দিকে তুলে রাখা।

(৪) চুল কেটে চাঁদের আকৃতি বানানো।

(৫) চুলের মাঝে গর্তের আকার তৈরি করা।

(৬) মাথার সামনের দিক থেকে চুল কামানো। (অর্থাৎ চুল কাটা বা রাখার ক্ষেত্রে সুন্নত তরীকার অনুসরণ করতে হবে। বর্তমান কিংবা প্রাচীন কোনো ফ্যাশান কিংবা ভিন্ন ধর্মীয় রীতি-নীতির অনুসরণ করা যাবে না। জীবনের সর্বক্ষেত্রের মতো এ ব্যাপারেও সুন্নতী পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে- অনুবাদক)

(৭) পায়জামা বা লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পড়া

(৮) জামা, জুব্বা, আবা ইত্যাদি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে রাখা। (মহিলাদের জন্য টাখনুর নিচে পোশাক ঝুলিয়ে পড়া জায়েয।)

(৯) পাগড়ির পিছনের অংশ কোমরের নিচে ঝুলিয়ে রাখা।

(১০) কুসুম কিংবা জাফরান কিংবা নাপাক রঙে রঙ্গীন করা জামা-কাপড় পরিধান করা।

(১১) চার আঙ্গুলের বেশি রেশমী বা জরির কাপড় পরা অথবা ছেলেদেরকে পরিধান করানো।

(১২) কাফের, মুশরিক বা অন্য কোনো ধর্মের ধর্মীয় পোশাক পরিধান করা।

(১৩) পুরুষের জন্য এক মেছকাল এর বেশি রূপার আংটি ব্যবহার করা

(১৪) পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা।
(১৫) মেয়েদের জন্য হাইহিল (উঁচু গোড়ালীওয়ালা) জুতা-স্যাণ্ডেল পরা ।
(১৬) বাজনাওয়ালা অলঙ্কার ব্যবহার করা।
(১৭) এমন পাতলা বা টাইট বা ছোট পোশাক পরা যাতে রিয়া বুঝা যায়।
(১৮) কোনো নারীর প্রতি কিংবা কোনো পুরুষের প্রতি কামপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকানো।
(১৯) মেয়েদের সঙ্গে অথবা ছোট ছেলেদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করা।
(২০) পুরুষের জন্য কোনো গায়রে মাহ্‌রাম নারীর সঙ্গে অথবা নারীর জন্য কোনো গায়রে মাহ্‌রাম পুরুষের কাছে বসা।
(২১) কোনো নির্জন জায়গায় থাকা।
(২২) একেবারে অনন্যোপায় অবস্থা ছাড়া পরস্পরের (অর্থাৎ নারীর জন্য পুরুষের আবার পুরুষের জন্য নারীর) সম্মুখে উপস্থিত হওয়া। চাই সে পীর হোক বা খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হোক।
(২৩) আর যখন ও যেখানে ভীষণ অপারগতাবশত নিরুপায় হয়ে পড়বে, সেই নিরুপায় অবস্থাতেও মহিলাদের জন্য মাথার চুল, হাত, পায়ের গোছা এবং গলা ইত্যাদি গায়রে মাহরামের সম্মুখে খোলা হারাম।
(২৪) উত্তম পোশাকে এবং অলঙ্কারে সজ্জিতা হয়ে পুরুষের সম্মুখে আসা তো একেবারেই মন্দ কাজ।
(২৫) এমনিভাবে গায়রে মাহরাম পুরুষ ও নারীর মধ্যে পারস্পারিক হাসি-ঠাট্টা করা।
(২৬) অপ্রয়োজনীয় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথাবার্তা বলাবলি করা, এ-সকল বিষয় পরিত্যাগ করতে হবে।
(২৭) খাৎনা, আকীকা বা ধুমধামের বিয়ে-শাদীতে একত্রিত হওয়া বা বরযাত্রী হওয়া। অবশ্য বিয়ে পড়ানোর সময় কাছের আত্মীয়স্বজনের সমবেত হওয়াতে দোষের কিছু নেই।
(২৮) গর্বের জন্য, নামের জন্য কিংবা লোক দেখানোর জন্য কোনো কাজ করা, যেমন বর্তমানে সামাজিক প্রথা হিসাবে বিয়ে-শাদীতে অথবা কারো মৃত্যুতে যিয়াফত বা খানা-পিনার বিশাল আয়োজন করা হয়, তাতে টাকা পয়সার লেনদেন হয়। এসব কাজ ছাড়তে হবে। এমনিভাবে অপচয় করা, কাপড়-চোপড়, পোশাক-আশাকে অতিরিক্ত সাজ-সজ্জার মাধ্যমে অহঙ্কার প্রকাশ করা।

(২৯) কেউ মারা গেলে তার জন্য চিৎকার করে কান্নাকাটি করা।
(৩০) মৃত ব্যক্তির তেসরা, চল্লিশা, বার্ষিকী ইত্যাদি পালন করা এবং যুগ যুগ ধরে প্রচলিত এ ধরনের (ওরশ ইত্যাদি) অনুষ্ঠানে দূর-দূরান্ত থেকে মৃত ব্যক্তির নামে সমবেত হওয়া।
(৩১) মৃত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় শরীয়ত মুতাবেক বণ্টন না করে এমনি এমনি দান করে দেওয়া।
(৩২) নারীদেরকে প্রাপ্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা অর্থাৎ তাদের ন্যায্য পাওনা প্রদান না করা।
(৩৩) নেতা বা শাসক হলে গরীব-দুঃখীদের উপর জুলুম অত্যাচার করা।
(৩৪) মিথ্যা উত্তরাধিকারের দাবি করা।
(৩৫) বন্ধকী বস্তু এবং ঘুষের আয়-খাওয়া।
(৩৬) জীব-জন্তুর ছবি তৈরি করা বা ছবি রাখা।
(৩৭) সখ করে কুকুর পোষা।
(৩৮) ঘুড়ি উড়ান।
(৩৯) আতশবাজী জ্বালানো, কবুতরের লড়াই, মোড়গের লড়াই ইত্যাদি পেশা গ্রহণ করা।
(৪০) ছেলেদেরকে ঐসব পেশা গ্রহণের অনুমতি দেওয়া বা এসব দেখার জন্য পয়সা দেওয়া।
(৪১) গান শোনা, বাজনাসহ বা বাজনা ছাড়া।
(৪২) বিভিন্ন বুযুর্গের নামে যে সকল ওরশ হয়ে থাকে, তাতে অংশগ্রহণ করা।
(৪৩) কোনো বুযুর্গের নামে মানত মানা।
(৪৪) প্রচলিত ভ্রান্ত তরীকায় ফাতিহা বা ইয়াযদহম ইত্যাদি পালন করা।
(৪৫) প্রচলন অনুযায়ী মিলাদ শরীফ করা।
(৪৬) মহান বুযুর্গদের বা নবী রাসূলদের বরকতপূর্ণ কোনো বস্তু (যেগুলো বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত আছে) প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে ওরশের মতো ইনতেযাম করা। অথবা ঐ সময় নারী-পুরুষের মেলামেশা বা সামনা সামনি হওয়া।
(৪৭) শবে বরাতের হালুয়া বানানো।
(৪৮) মহররমের তাজিয়া মিছিল করা।
(৪৯) রমযান মাসে কুরআন খতম করার পর জরুরি মনে করে সিন্নি বিতরণ করা।
(৫০) টোনা-টোটকা করা।

(৫১) ফাল খোলা অর্থাৎ ভাগ্যের ভালো-মন্দ জানার উদ্দেশ্যে গণকের কাছে যাওয়া। কোনো জ্যোতিষী বা জিনগ্রস্থ ব্যক্তির কাছে কোনো কথা জানতে চাওয়া।
(৫২) গীবত করা।
(৫৩) চোগলখুরী করা।
(৫৪) মিথ্যা কথা বলা ।
(৫৫) ব্যবসায়ী ব্যক্তির জন্য ক্রেতার সঙ্গে প্রতারণা করা।
(৫৬) নিরুপায় না হলে অবৈধ চাকুরী করা।
(৫৭) বৈধ চাকুরীর দায়িত্ব ঠিকমতো পালন না করা।
(৫৮) স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি করা।
(৫৯) স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার অর্থ খরচ করা।
(৬০) অথবা তার অনুমতি ছাড়া কোথাও যাওয়া।
(৬১) হাফেযদের জন্য মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে অথবা তারাবীর নামাযে কুরআন শোনায়ে টাকা নেয়া। (মৌলবীরা) ওয়াজ করে অথবা মাসআলা বলে দিয়ে টাকা নেওয়া। বহস-মূবাহাসার (তর্ক-বিতর্কের) মধ্যে জড়ানো।
(৬৯) দরবেশ ধরনের লোকদের পীর হওয়ার বা মুরীদ করার আকাঙ্ক্ষা করা।
(৭০) তাবিজ-কবচের পেশা গ্রহণ করা।
এই ছিল করণীয় ও বর্জনীয় কাজসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা। প্রয়োজনমতো বিশদ আলোচনা অধমের (থানভী রহ.) রিসালা ও কিতাবসমূহে পাওয়া যাবে।

পীরে কামেল চেনার উপায়

কামেল পীরের দশটি আলামত রয়েছে–
(১) যার মধ্যে আবশ্যক পরিমান দীনের ইলম আছে।
(২) যিনি আকায়েদ, আমাল এবং আখলাকের ক্ষেত্রে শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণ করেন।
(৩) যার মধ্যে পার্থিব লোভ-লালসা নেই, অর্থাৎ টাকা-পয়সার সম্মানের, সুখ্যাতির, প্রতিষ্ঠার, নেতৃত্বের বা কর্তৃত্বের লোভ নেই। যিনি নিজেকে 'কামেল' বলে দাবি করেন না। কারণ এ দাবিটাও দুনিয়াবি লালসার অর্ন্তভূক্ত।

(৪) যিনি কোনো কামেল পীরের সোহবতে বেশ কিছু সময় কাটিয়েছেন।
(৫) যাকে সমসাময়িক আমানতদার, ভারসাম্যপূর্ণ ও বিচক্ষণ উলামায়ে কেরাম, পীর মাশায়েখ 'কামেল' মনে করেন।
(৬) যার প্রতি সাধারণ জনগণের চেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ ঈমানদার বুদ্ধিমান ও দীনের সমঝদার লোকেরা বেশি আকৃষ্ট হন।
(৭) যার মুরীদদের মধ্যে শরীয়তের হুকুম-আহকামের অনুসরণ এবং দুনিয়াবি লোভ-লালসা পরিত্যাগের বিচারে অধিকাংশের অবস্থা ভালো পাওয়া যায়।
(৮) যিনি নিজ মুরীদগণের অবস্থার প্রতি যত্ন ও মমতার দৃষ্টি রেখে তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে তা'লীম ও তালকীন করতে থাকেন। এবং তাদের কোনো বড় ধরনের দোষ-ত্রুটির কথা শুনলে বা দেখলে সেটা দূর করতে এবং সংশোধন করতে থাকেন। মুরীদদের আপন আপন স্বাধীন মর্জির উপর চলতে দেন না।
(৯) যার সোহবতে কিছুদিন থাকলে দুনিয়ার আকর্ষণ কমে এবং আল্লাহ্‌র ভালোবাসা বাড়ে।
(১০) নিজেও তিনি রীতিমতো যিকির ও শোগল করে থাকেন। নিজে আমল না করলে অথবা আমলের সংকল্প না থাকলে তার তা'লীম ও তালকীনের মধ্যে বরকত হয় না।
যেই পীরের মধ্যে উপরোক্ত গুণগুলো পাওয়া যাবে তিনি নিঃসন্দেহে একজন কামেল পীর। কামেল পীরের এইসব আলামত কারো মধ্যে পাওয়া গেলে এরপর উচিৎ নয় তার কোনো কারামাত (কেরামতি) খোঁজা, কিংবা তিনি দুআ করলে কবুল হয় কিনা, অথবা তার মধ্যে কোনো বাতেনি ক্ষমতা আছে কিনা, এগুলো খোঁজা। এই জাতীয় কৌতুহল একেবারেই অর্থহীন। কেননা এই বিষয়গুলো পীর কিংবা অলী হওয়ার জন্য মোটেও জরুরি নয়। এমনিভাবে এটাও খোঁজ করা উচিৎ নয় যে, তিনি তাওয়াজ্জুহ দিলে মানুষ একেবারে অস্থির হয়ে ছটফট করতে থাকে কিনা। বুযুর্গ বা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য এটা জরুরি কোনো অনুসঙ্গ নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা 'নাফসানী তাসাররুফ' অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির নফসের মধ্যেই আল্লাহ্‌র দেওয়া একটি ক্ষমতা, যেটি মশক ও অনুশীলনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। কোনো ফাসেক-ফাজের এমনকি কোনো অমুসলিমও অভ্যাস ও অনুশীলনের মাধ্যমে ঐ শক্তি অর্জন করতে পারে। (তাহলে কি ওদেরকেও কামেল বলতে হবে?)

তাছাড়া এতে খুব একটা কল্যাণ নেই, কারণ এর আছর বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। শুধু একটি ক্ষেত্রে এর উপকারিতা ও কল্যাণ বুঝা যায়। সেটা হল কোনো মুরীদ যদি খুবই নির্বোধ হয় হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তার মধ্যে যিকিরের কোনো আছর না হয়, তাকে পীর সাহেব কিছুদিন পর্যন্ত তাওয়াজ্জুহ দিতে থাকলে ঐ মুরীদের মধ্যে যিকিরের প্রভাব কবুল করার যোগ্যতা তৈরি হয়ে যায়। এটা নয় যে পীর সাহেব তাওয়াজ্জুহ দিলে মুরীদের মধ্যে উথাল-পাথাল শুরু হয়ে যাবে আর সে লাফালাফি করতে থাকবে। -কাছদুস সাবীল থেকে

শরীয়ত, তরীকত, মা'রেফাত ও হাকীকতের ব্যাখ্যা

প্রশ্নঃ দয়া করে সংক্ষিপ্ত আকারে শরীয়ত, তরীকত, মা'রেফাত ও হাকীকতের তাৎপর্য ও বাস্তবতা এবং এগুলোর পারস্পারিক সম্পর্ক জানাবেন।

জবাবঃ পাগল, মা'যূর ও অক্ষম ছাড়া সুস্থ সাবালক শ্রেণীর জন্য আরোপিত ইসলামের আদেশ-নিষেধ বা আহকামের সমষ্টির নাম হল শরীয়ত। এর মধ্যে ইসলামের জাহেরি ও বাতেনি সকল আমলই সামিল রয়েছে। আর মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্বসূরী প্রাথমিক আলেমদের পরিভাষায় 'ফেকাহ' শব্দটিকে এর (শরীয়তের) প্রতিশব্দ মনে করা হত। যেমন ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে ফেকাহ শব্দের সংজ্ঞায় বর্ণিত হয়েছে- معرفة النفس ما لها وما عليها (মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় আহকাম জানা)। এরপর মুতাআখ্খিরীন উলামায়ে কেরামের পরিভাষায় আহকামে জাহেরার (বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলগুলোর) সঙ্গে সম্পৃক্ত শরীয়তের অংশকে নাম দেওয়া হয়েছে ফেকাহ। আর শরীয়তের অপর অংশ যা আমালে বাতেনির সঙ্গে সম্পৃক্ত তার নাম রাখা হয়েছে তাসাউফ। ঐ আ'মালে বাতেনির তরীকাগুলোকে তরীকত বলা হয়। আ'মালে বাতেন সংশোধনের দ্বারা 'কলব' হয় নির্মল ও স্বচ্ছ, তাতে 'কলবের' মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় সৃষ্টি বিষয়ক এমন কিছু হাকীকত যা বস্তুজগত ও উর্ধজগতের নানান বিষয় বিশেষত আ'মালে হাসানা ও আ'মালে সাইয়্যেয়াহ (ভালো আমল ও মন্দ আমলের)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। আরো প্রতিবিম্বিত হয় মহান আল্লাহ্র সিফাত ও ফেয়েল (গুণ ও কর্ম) বিষয়ক হাকীকত, বিশেষত আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যবর্তী মুআমালা। উক্ত উম্মোচিত বিষয়সমূহ বা 'মাকশূফাত'কে হাকীকত বলা হয়। উম্মোচন বা 'ইনকিশাফ'কে বলে মা'রেফাত। আর সাহিবে ইনকিশাফকে বলা হয় মুহাক্কিক ও আরিফ।

এ সকল বিষয়ই শরীয়তের সঙ্গেই সম্পর্কিত। আর সর্বসাধারণের মাঝে যে কথাটি প্রচলিত 'শরীয়ত' শুধুমাত্র আহকামে জাহেরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশকে বলা হয়, এ-কথাটি কোনো বিজ্ঞজন থেকে বর্ণিত নয়। সর্বসাধারণের ঐ বক্তব্য এবং এর উদ্দেশ্য কোনোটাই শুদ্ধ ও সঠিক নয়। কেননা এর মাধ্যমে শরীয়তকে জাহের এবং বাতেন নামে বিভক্ত করে জাহের ও বাতেনের মধ্যে বৈপরীত্যের ভ্রান্ত বিশ্বাস চালু করা হচ্ছে। –আল্লাহু আ'লাম।

ইলমুল ইয়াকীন, আইনুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীন এর ব্যাখ্যা

বাস্তবসম্মত সুদৃঢ় বিশ্বাসকে বলা হয় ইয়াকীন। জ্ঞানের স্তর যদি শুধু এতটুকুই হয় তবে সেটা ইলমুল ইয়াকীন। আর ঐ স্তরের সঙ্গে যদি 'গলাবায়ে হাল' প্রবল অভিব্যক্তিও যুক্ত হয় কিন্তু ঐ প্রবলতার মধ্যে জ্ঞাত বিষয়ের সামনে অজ্ঞাত অদৃশ্য না হয় তাহলে আইনুল ইয়াকীন। অভিব্যক্তির প্রবলতা যদি এতটা হয় যাতে অজ্ঞাত অদৃশ্য হয়ে যায় তাকে হক্কুল ইয়াকীন বলে।

মুতাকাদ্দিমীন এবং মুহাক্কিকীন এর সাধনা পদ্ধতির পার্থক্য এবং মুহাক্কিকগণের পদ্ধতির প্রাধান্য

প্রশ্নঃ নিঃস্ব অসহায়দের আশ্রয়স্থল, পথহারা গুমরাহ লোকদের পথের দিশারী হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব থানভী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী হুযূরের দরবারের এক অখ্যাত অধম খাদেম নিবেদন করছে-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি এবং রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করছি।

আম্মাবাদ, অধম আজ নিজের কিছু অবস্থা হুযূরের খিদমতে পেশ করার অনুমতি চাচ্ছে। যদিও সে অবস্থাগুলো খুবই নোংরা এবং লজ্জাজনক। উপরন্তু এতে হুযূরের মূল্যবান সময়েরও অপচয় করা হবে। কিন্তু কী আর করা! জিজ্ঞাসাই হল মূর্খ রুগীর চিকিৎসা। তা ছাড়া আল্লাহ্ তাআলা তার প্রিয় বান্দাদের হাতে দিয়েছেন এমন এক পরশপাথর (যা অসম্ভবকে সম্ভব করে দেয়।) 'ছিল যা এক খুনের দরিয়া করে দিলেন তাকে এক স্বচ্ছ পানির নহর।'

আশারাখি হুযূর 'তুমিও সেইরূপ এহসান ও দয়া কর যেরূপ আল্লাহ্ তোমার প্রতি করেছেন' আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করে সময় অপচয়ের কষ্টটুকু মেনে নেবেন। এই অধমের অনেক বড় আকাঙ্ক্ষা রয়েছে হুযূরের কাছে।

خواہی کہ خدائے بر تو بخشند - با خلق خدائے کن نکوئی

(পেতে চাও যদি তুমি আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমা সৃষ্টিকে দয়া কর, কর তাকে ক্ষমা)

হুযূরের তো জানা আছে এই নরাধমের লেখাপড়া সম্পন্ন হয়েছে প্রচলিত ভালো-মন্দ মিশ্রিত শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র ফযলে বুযুর্গদের পদসেবারও কিছু সুযোগ পেয়েছি। সেই সামান্য পদসেবার বদৌলতেই অধমের 'কলবী হালত' (মনের অবস্থা) সাধারণ হিসাবে ভালোই ছিল। সকল বিষয়েরই শুদ্ধ ও সঠিক মর্ম উপলব্ধির ক্ষমতা ছিল। ওয়ায-নসীহত, কুরআন তিলাওয়াত এবং যিকির ইত্যাদির ভালো তাছীর (প্রভাব) আমার মধ্যে হত। সব বিষয়ের গভীর (নিগুঢ় রহস্য) পর্যন্ত আমার দৃষ্টি পৌঁছে যেত।

এখন থেকে ছয়-সাত বছর আগের কথা, তখন আমার অবস্থা ছিল এরকম- অল্প সময়ের জন্যও যদি কোনো খারাপ লোকের সংস্পর্শে যেতাম তবে কলব সঙ্গে সঙ্গেই সেটা বুঝত এবং সেই সংস্পর্শ অপছন্দ ও অগ্রাহ্য করে বসত। আর নেক সোহবত পেলে এবং ভালো কথা শুনলে সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে চাঞ্চল্য জেগে উঠত। মন প্রফুল্ল ও আনন্দিত হয়ে যেত।

একবারের ঘটনা বলি, জনাব হাফেয আব্দুর রহমান সাহেব মুরাদাবাদীর নিকট যাওয়ার সুযোগ হল, ইতিপূর্বে আমি তার সম্পর্কে বেশি কিছু জানতাম না কিন্তু তার কাছে যাওয়ার পর আমার মনের মধ্যে এমন নেক অনুভূতি জেগে উঠল যা থেকে আমি চিনে নিলাম যে, হাফেয সাহেব একজন নেককার-ভালো মানুষ এবং তার সোহবত নিঃসন্দেহে নেক সোহবত। আমার মনের এই অনুভূতির পর বাস্তবে তাঁর সম্পর্কে তাহকীক ও অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, আমার ধারণা একদমই ঠিক।

এমনিভাবে একবার দিল্লির বাহিরে মসজিদে নামায পড়তে গেলাম। মসজিদ সংলগ্ন একটি মাজার ছিল। মনের মধ্যে ঐ মাজারের প্রতি এমন তীব্র আকর্ষণ তৈরি হল যে, কখন যেন আমি মাজারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং দেখলাম যে, সেখান থেকে নড়তেই ইচ্ছা হচ্ছে না। শেষে শীলা খণ্ডে নাম খোঁজার চেষ্টা করলাম এবং জানলাম যে সেটা হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজার।

মোটকথা তখন যে কোনো বস্তুর ভালো-মন্দের ফয়সালা আমার মনই সঠিক ভাবে করে দিত। সব কিছুর ভালো-মন্দের পার্থক্য যেন স্পষ্টই আমার চোখে

পড়ত। দুধকে দুধ এবং পানিকে পানিই মনে হত। দুধকে পানি এবং পানিকে দুধ কখনোই মনে হত না।

অনেক জায়গায় এমন হয়েছে যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আমাকে আম জনতার সম্মুখে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। সেখানে এই অধম বিষয়টির সকল দিক ও বাস্তবতা এমন বিশদভাবে আলোচনা করেছে যে, উপস্থিত পক্ষ বিপক্ষ উভয় দলই আমার কথায় একমত হয়ে গেছে। বিষয়টির প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠার পর তাদের কাছে প্রমাণিত হয়ে পড়েছে যে, তাদের মত পার্থক্যটি ছিল 'শাব্দিক' বাস্তব ভিত্তিক নয়।

একবার এক মজলিসের আলোচ্য বিষয় ছিল, 'বাদ্য যন্ত্রের বাজনা অনেক রোগের ওষুধ' তো এমন উপকারী বস্তু হারাম কেন?

আমি বললাম– 'আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে যে, বাদ্যযন্ত্রের বাজনায় কেন উপকার হয়? বাদ্যযন্ত্র থেকে সূর সৃষ্টি হওয়ার পেছনে আসল কারণ এই যে, এর মধ্যে থাকে এক ধরনের রূহ– যাকে লোকে বলে বিদ্যুৎ, বিশেষ পদ্ধতিতে ঐ বিদ্যুতের মধ্যে নাড়া লাগার কারণে বাতাসের মধ্যে বা বাতাসেরও বিদ্যুতের মধ্যে সৃষ্টি হয় কম্পন, যেহেতু ইনসানী রূহের মধ্যে জড় রূহের কিছুটা সামঞ্জস্যতা রয়েছে অথবা এভাবে বলা যায় যে মানব দেহে রয়েছে বিদ্যুৎ, এ কারণে তারও ঝোঁক তৈরি হয় বাহিরের প্রতি। একেই বলা হয় আনন্দ এবং প্রাকৃতিক তাপমাত্রার সতেজতা। ইনসানী রূহ যেহেতু আশরাফ (ভদ্র ও শ্রেষ্ঠ) ফলে ঐ বহির্মুখী বায়বীয় সম্পর্ক থেকে নিজেকে সংকুচিত করে ইনসানী রূহের মহিমায় সামিল হয়ে যায়। এর পরিণতিতে তাতে (ইনসানী রূহের মধ্যে) ধীরে ধীরে ঘনত্ব বাড়তে থাকে। ইনসানী রূহের মধ্যে যে স্বচ্ছতা (নূরানিয়াত) থাকা উচিৎ তা থাকে না। এর আলামত প্রকাশ পায় এভাবে যে, সব উন্নত জ্ঞান, বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক লোপ পায় এবং বৃদ্ধি পায় নীচুতা, নিকৃষ্টতা। কার্যকলাপ ও অভ্যাসের ক্ষেত্রে পবিত্রতা ও স্বচ্ছতার স্থান দখল করে নেয় নোংরামী ও মলিনতা। এমন কি ধীরে ধীরে এটা রূহকে অতিক্রম করে প্রভাব ফেলতে থাকে দেহের উপর। এই ধরনের লোকদের রক্তের ও পিত্তের রোগ খুব কম হয়। শ্লেষ্মা ও কফের রোগ বেশি হয়। সবচেয়ে বেশি হয় বিষাদগ্রস্ততা (হৃদরোগ)।

সুতরাং একথা বলা ঠিক নয় যে বাদ্য-বাজনা কোনো রোগের ওষুধ। এই ভুল ধারণার কারণ এই যে, বাদ্য বাজনার মাধ্যমে রূহের মধ্যে একটু নাড়া পড়ে,

যাকে ভিন্ন শব্দে বলা হয় আনন্দ। নতুবা পরিণাম হিসাবে বলা যায় এতে বরং দেহ ও আত্মার ক্ষতিই সাধিত হয়। যেমন শরাব বা মদের বেলায় হয়। শারাবের মূল উপাদান অতি দ্রুত রূহের মধ্যে মিশে তাকে আলগা ও ঢিলে করে দেয়। আপন গঠন বেড়ে যাওয়ার ফলে রূহ আকৃষ্ট হয় বাহিরের দিকে। এরই নাম স্বাভাবিক তাপমাত্রার সঞ্জীবন বা প্রাণবন্ততা। মূর্খ লোকেরা এটাকেই মনে করে শক্তি। কিন্তু যেই সুক্ষ্ম রূহ কর্তৃত্ব চালাত মানব মস্তিষ্কের উপর, তাতে অজানা উপাদান মিশ্রিত হওয়ার ফলে তার কার্যকলাপের মাঝেও সেগুলোর প্রভাব পড়ে। এবং তার কাজ-কর্ম আর মানব সুলভ থাকে না। মিশ্র সেই ভিন্ন উপাদানের পরিমান হিসাবে রূহের স্বাভাবিক কার্যক্রমের মাঝে সৃষ্টি হয় প্রতিবন্ধকতা, এরই নাম নেশা। কিছুকাল নিয়মিত পান করলে মানবাত্মার ঘণত্ব স্থায়ীরূপ নেয়। কর্মের বিশৃঙ্খলতা হয়ে পড়ে দ্বিতীয় স্বভাব। এবং সেই সকল জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি থেকে একেবারেই সম্পর্কহীন হয়ে যায় যা মানবীয় স্বভাবের উপযোগী। বলা তো হয়- 'শরাব সকল প্রকার শক্তিবর্ধক' এটা সত্য হলে তো শরাবীদের (মদখোরদের) মস্তিষ্কগত উন্নতি হওয়ার কথা ছিল সর্বাধিক। অথচ বাস্তবতা, অভিজ্ঞতা এবং সর্বশেষ গবেষণার ফলাফল এর একেবারেই উল্টা। ইংল্যান্ডে শরাব পান করা হয় রীতিমতো এবং সতর্কতার সঙ্গে। সেই ইংল্যান্ডের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, শরাব পানকারীদের শতকরা ৮৩ জনই বিষন্নতা রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। এর কারণ এটাই যে, শরাব পানের তথাকথিত সাময়িক আনন্দ এবং শক্তি প্রকৃতপক্ষে একটি ধোকা। এর আসল বাস্তবতা হল রূহের অন্তসার শূন্যতা ও বিক্ষিপ্ততা, বিবেক ও বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নতা এবং নিজ কর্মের প্রতিবন্ধকতা। আর প্রকৃত পক্ষে 'হারামের মধ্যে কোনো আরোগ্য নেই' কথাটিই সর্বাধিক বাস্তব। এই সবের ব্যবহারের ফলে মানবীয় স্বভাব পরিণত হয় পশুর স্বভাবে। আর মৌলিক দেহরসের মৌল উপাদানের মধ্যে প্রাধান্য পেয়ে যায় বিমর্ষতা ও উন্মাদনা।'

এই আলোচনা মানুষ ভীষণ পছন্দ করল। তারা বলাবলি করতে লাগল 'একদম ঠিক কথা। কারণ নিয়মিত মদ্যপান যাদের নেশা, বিষন্নতা, উম্মাদনা বা মানসিক রোগের উৎস তারাই।'

এমনিভাবে আরো অনেকবার অনেক সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম আলোচনায় আমার এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু সর্বাধিক শুকরিয়ার ব্যাপার এটাই যে মুরব্বিদের কথা

আমার মনে ছিল যে, 'এসব ব্যাপারে মনোযাগ দেওয়া উচিৎ নয়।' এ কারণে কখনোই এগুলোকে কোনো কামাল বা কৃতিত্ব মনে হয় নি। ভালো হালতে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলেছি আর প্রতিকূল অবস্থায় পরোয়া করি নি।

এরপর প্রায় তিন বছর হতে চলল আমার কলব বা মনের মধ্যে তৈরি হয়েছে এর একেবারে উল্টো ভাব। উপরোক্ত 'হালতে মাহমুদাহ' বা প্রশংসনীয় অবস্থার বেলায় তো সেদিকে আমার কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না কিন্তু বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার কারণে আমি এত দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লাম যে, 'নাউযুবিল্লাহ্' মন্দ কাজগুলো ভালো এবং ভালো কাজগুলোকে মন্দ মনে হতে থাকল। যেমন ইতিপূর্বে বিপরীত ক্ষেত্রে হত। আলহামদুলিল্লাহ্! কলবের এই অবস্থার কাছে আমি কখনোই পরাজিত হই নি কিন্তু অবস্থা এত শোচনীয় পর্যায়ে গিয়েছিল যে, ভালো কথা বারবার শুনলেও বিন্দুমাত্র তাছীর আমার মধ্যে হত না। পক্ষান্তরে খারাপ কোনো কিছুর বাতাস লাগলেও তাছীর হত এবং একেবারে অনিচ্ছাতেও সেদিকে মনের আকর্ষণ তৈরি হয়ে যেত।

আমার চোখে ধরা পড়ত অসুমলিমদের রীতি-নীতির সৌন্দর্য, বিজ্ঞানের অপরিহার্যতা, আধুনিক জ্ঞান-গবেষণার প্রতি মুগ্ধতা। সকল বিষয়ে আমার মনের মধ্যে ছিল বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনার পক্ষপাতিত্ব। হক কথার তাছীর না হওয়া, বাতিলের তাৎক্ষণিক তাছীর হওয়া, আলীগঢ় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দিকে মর্যাদার দৃষ্টিতে আর মাদরাসার তালেবে এলেমদের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাতাম। ধনীদের প্রতি আকর্ষণ, দরিদ্রদের প্রতি বিরক্তি, মান-মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা এবং আবশ্যকতা, ইসলামী শরীয়তের কিছু বিষয়ের ব্যাপারে আপত্তি (নাউযুবিল্লাহ্) এবং সেগুলো সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি, আধুনিক তরুণ-যুবকদের মতোই আমল, আখলাক ও আখিরাতকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পার্থিব উন্নতিকেই উন্নতি মনে করা এই সকল বিষয়ই মনের মধ্যে জাগত এবং কোনো প্রকার সংশয় কিংবা বিপরীত কোনো যুক্তি প্রমাণ আর মাথায় আসত না।

আলহামদুলিল্লাহ্! এসব কিছুই ছিল ওয়াস্ওয়াসার পর্যায়ে, যাকে এ অধম সর্বদা বিপদজনক মনে করত। 'এখতিয়ার বা ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ঐ ওয়াস্ওয়াসাকে প্রতিরোধে যত্নবান হয়েছি এবং ওটা যেন আমার আমলের উপরও তাছীর করতে না পারে সেজন্য সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা চালিয়েছি। যেমন উলামায়ে কেরাম এবং নেককার লোকদের ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে মেলামেশা, দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করে দিলাম। (এক্ষেত্রে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার লক্ষ

করেছি যে, অজানা-অচেনা লোকদের সঙ্গে মেলামেশায়, সাক্ষাতে এ অবস্থার ক্ষতি কম আর পরিচিত, ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে মেলামেশায় হত বেশি। এ কারণেই চেনা-জানাদের থেকে দূরে সরে গেলাম বেশি করে। অথচ আমার পেশার জন্য এটা ছিল ক্ষতিকর। খবরের কাগজ পড়া একেবারেই ছেড়ে দিলাম। সাক্ষাতপ্রার্থীদের বলে দিতাম– নিজের জরুরি কথা ছাড়া আর কোনো প্রসঙ্গে যেন কথা না বলে। এই জন-বিচ্ছিন্নতাকে পূর্ণাঙ্গ করার উদ্দেশ্যে শেরোয়ানী পরা ছেড়ে দিলাম এবং ছাত্রদের মতো সাধারণ বেশ-ভূষা অবলম্বন করলাম। যাতে লোকদের বিশেষত ধনীদের নিজ থেকেই বিরক্তি এসে যায়। এর ফলাফল এই দাঁড়াল যে, সকলে আমাকে 'মৌলবী' বলে ডাকতে লাগল। এইসব কার্যকলাপের ফলে আমার পেশার যে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল, তার পরোয়া করলাম না। পূর্বে যেহেতু মনের মধ্যে সরলতা ছিল এবং এখন অবস্থা একেবারে উল্টা হলেও বাতিলের প্রতি আকর্ষণ হওয়ার সময় এ বিষয়টুকু অবশ্যই বুঝতাম যে, বর্তমানের অনুভব পূর্বের অনুভূতির একেবারেই উল্টা। ফলে মনকে সে-দিক থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুরিয়ে নিতাম এবং অন্য কোনো খেয়ালে লেগে যেতাম। যখন কোনোভাবেই ঐ খেয়াল মন থেকে তাড়াতে পাড়তাম না তখন কোনো দুনিয়াবি কাজে যেমন চিঠিপত্র লেখা অথবা কথাবার্তায় লেগে যেতাম। যদি এতেও কোনো কাজ না হত তবে আখেরী অস্ত্র ছিল এই যে, দু-রাকাত নামায পড়ে দুআ করতাম-

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

অর্থ- হে আল্লাহ্! হে সকল অন্তরের বিবর্তনকারী! মেহেরবানী করে আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দাও।

আল্লাহ্র ফযলে এতে খুব উপকার হত। আবার কখনো আখেরী অস্ত্র ছিল এই যে, মনে মনে বলতাম আল্লাহ্ তাআলা আহকামুল হাকেমীন, তাঁর কোনো হুকুম-আহকামের জন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। হে আমার মন! তুমি কোনো যুক্তি খুঁজতে যেও না। আল্লাহ্র প্রশংসা যে, এই ব্যাপারটি ছাত্রকাল থেকেই আমার মনের মধ্যে এমনভাবে গেঁথে ছিল যে এতে বিন্দুমাত্রও খটকা ছিল না।

অমুসলিম কাফের-মুশরিকদের রীতি-নীতি খণ্ডনের কোনো যুক্তি যদিও সে সময় মনে আসত না তথাপিও সেটাকে মন থেকে তাড়ানোর উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করে তাদের ধর্ম ও নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে, আলোচনা করতে

থাকতাম। কাফেরদের জীবন আচরণের খারাবী ও মন্দ দিকগুলো মানুষের কাছে ফুটিয়ে তুলতাম। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতাম। এমনকি ঘড়িটাও একেবারে ঠেকায় না পড়লে পকেটে নিতাম না। বস্তুবাদী-নাস্তিক লেখকদের রচনাকে একেবারেই বর্জন করলাম। হক কথার কোনোরূপ তাছীর না হলেও ওয়ায মাহফিলে অবশ্যই শরিক হতাম। আলীগঢ়ের ছাত্রদের সাথে দেখা হলে মনোযোগ দিতাম না কিন্তু মাদরাসার তালেবে এলেমদের সঙ্গে লৌকিকতা (তাকাল্লুফ) করে হলেও সাক্ষাত করতাম, তাদের সুখে-দুঃখে এগিয়ে যেতাম। গরিবদেরকে ধনীদের উপর প্রাধান্য দিতাম। একবার এমন হল যে, এক ধনীর আহবান পেলাম আবার একই সময় এক বিধবা মহিলার কাছে যাওয়ার দরকার হল, আমি প্রথমে বিধবার প্রয়োজনে সাড়া দিলাম পরে গেলাম ধনীর কাছে। 'হুব্বেজাহ' (মর্যাদা বা পদের লোভ) এর চিকিৎসা এভাবে করতাম যে, কোথাও পরামর্শের উদ্দেশ্যে আমাকে এবং আমার পেশার অন্য কাউকে হয়ত ডাকা হল, তার প্রস্তাব ও মতামত আমার মতের বিপরীত বা ভুল হলেও আমি তাকেই সমর্থন করতাম যেন কাজটির দায়িত্ব সে পায়। খুব বেশি বেকায়দা হলে গোপনে তার ভুল সংশোধন করে তাকে সঠিক মাশওয়ারা দিতাম কিন্তু কিছুতেই যেন কাজটি আমার নামে না হয় এবং আমার কোনো কৃতিত্ব প্রকাশ না পায়, সে ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে রাখতাম। এতে আমার প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হল। কোনো পরোয়া করলাম না। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কখনো কখনো শিকারে যেতে হত। ফায়ার করার সিরিয়ালে প্রথম আমার নাম থাকত, সেটাকে নিয়ে যেতাম সর্বশেষে। আহকামে শরীয়তের মধ্যে যেসব পরিবর্তনের ধোকা মনে জাগত, জবরদস্তি সেটাকে মন থেকে তাড়াতাম। কোনো যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই সেটাকে সঠিক বলে মনকে বুঝাতাম। এরপরও মনের মধ্যে বেশি আন্দোলন হতে থাকলে হয়ত কুরআন শরীফ পড়তে বসতাম অথবা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। আল্লাহ্‌র রহমতে এতে পরিপূর্ণ সফল হওয়া যেত। কখনোই এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। এবং এই চেষ্টার পর ওয়াস্‌ওয়াসাও প্রায় শূন্যের পর্যায়ে চলে যেত।

আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সোহবতের বদৌলতে এ কথাটি মন মস্তিষ্কে গেঁথে ছিল যে, "আল্লাহ্ তাআলা 'হাকেমে মুতলাক' তিনি কোনো আইন কিংবা কোনো যুক্তি মানতে বাধ্য নন।" (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা ইনসাফগার হিসাবে সাধারণত

ভালো কাজের বদলা ভালো এবং মন্দ কাজের বদলা মন্দ দান করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এই ইনসাফের নিয়ম মানতে বাধ্য নন। তিনি ভালো কাজের বদলা যদি খারাপ দেন এবং মন্দের বদলা ভালো দেন তবে সেটাকে বেইনসাফী মনে করা যাবে না। একজন মুমিনকে এভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। কারণ তিনি হাকিমে মুতলাক তিনি যথেচ্ছ স্বাধীন- অনুবাদক)

উপরোক্ত 'ওয়ারেদাত'এর বিপদ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে সকল 'এলাজ' ও ব্যবস্থা নেহায়াত পাবন্দি ও গুরুত্বের সঙ্গে করেছি। এর মধ্যে কোনো ত্রুটি হলে এস্তেগফার করেছি। কিন্তু এইসব এহতেমাম করা সত্ত্বেও ঐসব ওয়াস্ওয়াসা মনের মধ্যে এমন দাগ কেটেছিল যে, 'এলাজ' বা ব্যবস্থা থেকে সামান্য গাফেল হলেই মনে হত যেন আমার কলব ঈমান হারা হয়ে গেছে। আর যখন গুনাহ কিংবা 'খেলাফে আউলা' কোনো কাজ হয়ে যেত মনে হতে যেন সকল মেহনত বেকার হয়ে গেছে।

পূর্বের সেই হালতের– যখন সব কিছুর হাকীকত বুঝতে পারতাম, কোনো ছায়াও খুঁজে পাই না মনের মধ্যে। যদিও সেই হালতের তামান্না ছিল না কিন্তু এই আশঙ্কা বারবার মনে জাগত যে, 'এর পরিণতি কী?'

এই অবস্থার মাঝে বারবার জনাব ওয়ালার (থানভীর রহ.) ওয়ায শোনার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু ওয়ায শুনবার সময় মনে হত যে, সব কথা এক কান দিয়ে ঢুকছে অন্য কান দিয়ে বের হচ্ছে। বিন্দুমাত্র তাছীর নেই। বরং উল্টো প্রত্যেক কথার বিপরীত জবাব আমার মনে ঘুরপাক খেত। সেগুলির তাছীরও হত এবং মনের মধ্যে থেকেও যেত। আগেই যেখানে মনের মধ্যে ছিল বাতিলের বদ আছর এখন আবার হক কথা শুনলে তার থেকেও এরকম বদ আছর হত। (নাউযুবিল্লাহ্)

একবার এই অধম অল্প সময়ের এক রেল সফরে হুযূরের (থানভী রহ.-এর) সঙ্গে ছিল। এই বিপদজনক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনে হুযূর বলেছিলেন- 'পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। এটা হয়ত শয়তানের পক্ষ থেকে জোড়ালো কোনো বাধা অথবা খুব উঁচু স্তরের 'হালতে মাহমুদাহ' আসন্ন অথবা কোনো এলেম 'এলকা' হতে যাচ্ছে।' একথা শুনে মনে ভীষণ শান্তি পেয়েছিলাম।

কিন্তু এরপরও পেরিয়ে গেল লম্বা সময়। অবস্থা বেড়েই চলছিল। এমনকি নাউযুবিল্লাহ্ দীন ইসলামকেই ভানভনিতা বলে মনে হত। অন্যসব ধর্ম তার চেয়ে ভালো মনে হত। হিন্দু ধর্মের সৌন্দর্যগুলো মস্তিষ্কে ঘুরপাক খেত।

(এখন অবশ্য সেগুলো কিছুই মনে নেই) আর সবচেয়ে বেশি সত্য ও বাস্তব মনে হত নাস্তিকতাবাদকে। হকের মুকাবিলায় সকল বাতিল ফেরকাকে ভালো মনে হত। এমনকি সুন্নীদের চেয়ে শিয়া, মাযহাবীদের চেয়ে লা মাযহাবী এবং বিদআত বিরোধীদের চেয়ে বিদআতীদের বেশি ভালো লাগত। সর্বাধিক অপছন্দ হত তাসাওউফপন্থীদের। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্! আমার এতটুকু হুঁশ ছিল যে, আমার রুচির বিকৃতি ঘটেছে। এই কারণে এই ইয়াকীন করে নিয়েছিলাম যে আমার (বর্তমান বিকৃত রুচির) কাছে যাকে যত বেশি খারাপ মনে হবে, প্রকৃত পক্ষে সে তত বেশি ভালো।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমার এই চরম অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হত তিনটি ক্ষেত্রে। তাহাজ্জুদের দ্বারা, তিলাওয়াতে কুরআন দ্বারা সেটা গুরুত্বহীন ও অমনোযোগিতার সাথে হলেও আর জনাবে ওয়ালার সোহবতের দ্বারা। যেদিন তাহাজ্জুদ বা তিলাওয়াত কাযা হয়ে যেত সেটা হত আমার মৃত্যুযন্ত্রণার সমতুল্য। চতুর্থ ভীষণ উপকারী ছিল মাশায়েখে চিশতিয়ার শাজারা পাঠ। তা পাঠ করতেই এক বিস্ময়কর অবস্থা তৈরি হত। মনে হত যে দিলের উপর কোনো কিছুর প্রলেপ দেয়া হয়েছে আর ঐসব আজে বাজে কল্পনা কিছু সময়ের জন্য দূর হয়ে গিয়েছে। আমি ঐ অবস্থার বর্ণনায় এর চেয়ে বেশি বলতে পারব না যে, দুনিয়া থেকে একদম আগ্রহ শূন্য হয়ে পড়তাম। এভাবে প্রায় তিন বছর পেরিয়ে গেল। বুযুর্গদের মুখে শোনা ছিল যে, 'ওয়ারেদাত'কে গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ নয়, ভালো হোক বা মন্দ। এই কারণে মনের মধ্যে কিছুটা সান্ত্বনা যদিও ছিল কিন্তু 'ইমদাদুস সুলূক' কিতাবে একবার দেখলাম যে, 'ওয়াস্ওয়াসা' হল বাল্প সমতূল্য যা সীমাহীন পেরেশানকারী কিন্তু খোদ সেটা কোনো 'মরয' বা রোগ নয়। এবং কোনো চেষ্টা দ্বারাই তার প্রতিরোধে সফল হওয়া যায় না। এর একটি শেকড় থাকে যা থেকে এই বৃক্ষ তৈরি হয়। যে পর্যন্ত ঐ মূল শেকড় উপড়ানো না যাবে সে পর্যন্ত ওটাকে থামানো সম্ভব হবে না। ঐ মূল শেকড় সন্ধান করা এবং তাকে উপড়ানোর চেষ্টা করা আল্লাহ্ ওয়ালাদের কাজ।

এই বক্তব্যের আলোকে আমার 'খাতরাত' (মনের মধ্যে জেগে উঠা বিপদজনক ওয়াস্ওয়াসা)গুলোর মূল শেকড় সন্ধানের চেষ্টা করলাম। কিন্তু অনুসন্ধান অনুযায়ী প্রাপ্ত ত্রুটিগুলো পরিত্যাগ করার পরও সাময়িক উপকার ছাড়া আর কোনো উন্নতি হল না। ফলে এমন আতঙ্ক তৈরি হল যে, এখন কী হবে? তাহলে কি আমার উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে গেছে? এ অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়ে গেলে কী হবে?

একবার দীর্ঘ প্রায় একমাস আমাকে শিয়াদের সঙ্গে থাকতে হয়েছিল, এ কারণে ঐ আতঙ্ক আরো বেড়ে গেল। এমন কি শারীরিকভাবেও ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়লাম। ট্রেনের আওয়াজ কানে গেলেই শরীর কেঁপে উঠত। একদিনের জন্য ডিপুটি খাজা আযীযূল হাসান মাজযুব (থানভী রহ. এর একজন গুরুত্বপূর্ণ খলিফা এবং তাঁর জীবনী লেখক) এর সোহবতে থাকার সুযোগ হল। জানি না তাঁর মাত্র একদিনের এই সোহবতের মধ্যে কী অসাধারণ শক্তি ছিল যাতে আমি ভীষণ শান্তি পেলাম এবং শারীরিক কম্পন একেবারেই দূর হয়ে গেল। এই শান্তি ও প্রশান্তি বেশ কিছুদিন বহালও থাকল। কিন্তু এরপর আবার ফিরে এল সেই অবস্থা। আমি অবাক ও বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতাম, ইয়া আল্লাহ্! এই দুটি চোখেই এক সময় আমি সব কিছু ঠিকঠাক দেখতাম, বস্তুর গভীর পর্যন্ত পৌঁছে যেত দৃষ্টি। আজ আমার সেই দুটো চোখই একেবারে উল্টো কাজ করছে। হক ও বাতিল মিশ্রিত বিষয়ের মধ্য থেকে এক সময় এরাই দুধকে দুধ ও পানিকে পানি হিসাবে আলাদা করে দিত। হক ও বাতিলকে পৃথক করে দিত। আজ সেই দুটো চোখই আলাদা করা তো দূরে থাক পানিকে দুধ এবং দুধকে পানি হিসাবে দেখায়।

এরই মধ্যে আরো একবার আমি থানা ভবনে গিয়ে হুযূরকে আমার করুণ অবস্থার কথা জানিয়েছিলাম। তখন হুযূর প্রশ্ন করেছিলেন- 'কোনো নতুন বই পুস্তক পড়েছি কি?' আমি জানিয়েছিলাম তেমন কিছুই হয় নি। আমি তো স্বেচ্ছায়ই এসব থেকে দূরে সরে থাকছি। খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়া ছেড়ে দিয়েছি।

আমার জবাব শুনে আপনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেছিলেন- 'মনে হচ্ছে এসবের কারণ আপনার স্বভাব প্রকৃতির পবিত্রতা ও মেযাজের নাযুকতা এবং ইনশাআল্লাহ্ এটা শীঘ্রই আপনা আপনি কেটে যাবে।'

হুযূরের এ কথায় আমার ভীষণ 'তাছাল্লী' হল। মনে খুব শান্তি পেলাম। তারপর সম্ভবত সাত-আট মাস হয়ে গেল। এর মধ্যে অল্প কিছুকাল মনের মধ্যে 'এতমিনান' (শান্তি ও প্রশান্তি) ছিল এরপর আবারও শুরু হল সেই পুরনো উম্মাদনা। তখন আমি এই সতর্কতা অবলম্বন করলাম যে নিজের বোধ ও বুঝকে একদম অনির্ভরযোগ্য স্থির করে নিলাম। এমন কি কেউ কোনো ফেক্হী মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে আমি অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করার অনুরোধ করতাম। গুরু সম্বন্ধে যে বইটি এ অধম লিখেছে সেটা এই সময়কালেরই রচনা। এই বইটির উপর আমার আস্থা নেই শুধু এই কারণে যে, এটি আমার

‘উল্টা বুঝ’ সময়কালের লেখা। আল্লাহ্ই জানেন কী সব হক, না-হক বা উল্টা সিধা কলম থেকে বেরিয়েছে। এ বইয়ের অনেক জায়গারই মাযমুন বা বিষয়বস্তু আমার কাছে ভুল বলে খটকা লেগেছে। ফলে সে-সব স্থান আমি চিহ্নিত করে রেখেছি। এ জরুরতের কারণেই আমি বইটির ধর্মীয় অধ্যায় পূর্ণটাই হুযূরকে শুনিয়েছিলাম। চিকিৎসা অধ্যায়টিও হুযূরকে শোনানোর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হুযূরের মূল্যবান সময় নষ্ট করাটা মুনাসিব বা সমিচীন মনে হয় নি এই মনোভাবের কারণে যে, চিকিৎসা বিষয়ে যদি কোনো ভুল হয়েও যায়, তবে কী আর গুনাহ হয়ে যাবে?

ঐ অবস্থার বিশদ বিবরণ কত আর বলব- ওয়ায শোনা ও বই পড়া থেকে দূরে দূরে থাকতাম। কারণ কোনো ভালো কথা কানে গেলে তাতে আরো বেশি ক্ষতি হত। অথচ একটা সময় ছিল খারাপ কথা শুনলে তাতে উপকারই হত।

বেশ কয়েকবারই হুযূরের ওয়ায শোনার সুযোগ হয়েছে। যেগুলো শোনার পর মনের প্রতিক্রিয়া হত এমন যে, ‘সেই পুরানো কথা যা মৌলবীরা সবসময় বলে থাকে।’

আমার ‘হালত’ এর বিবরণ যদি সংক্ষেপে প্রকাশ করতে চাই তবে বলতে পারি যে, ‘মুহসিনূল মালিক’ এবং অপরাপর ‘আহলে দুনিয়া’ এর অন্তরে যে কথাগুলো ছিল সেগুলোই আমার অন্তরে জায়গা করে নিয়েছিল। তবে হ্যাঁ একটু পার্থক্য ছিল, ঐ অবস্থার কাছে আমি আল্লাহ্র ফযলে এবং বুযুর্গদের দুআয় পরাজিত হই নি যেমন ঐ-সব লোক হয়েছিল। সুতরাং ‘আলহামদুলিল্লাহি আলা যা-লিক’ (এর জন্য আল্লাহ্রই প্রশংসা) এতটুকু চেতনা সর্বদাই ছিল যে, আমার এ ‘হালত’ সাময়িক এক ভগ্নদশা। ‘জাহলে মুরাক্কাব’ (অর্থাৎ এই খারাপ অবস্থাকে ভালো মনে করার গুনাহ) থেকে বেঁচে থেকেছি। অনেক ভেবেছি যে, এটা কোনো পাপের শাস্তি কিন্তু বুঝতে পরি নি যে, কোন পাপের?

এবার এক নতুন বিস্ময়ের কথা শুনুন, মিরাঠের মসজিদে খায়রে হযরতের এক ওয়ায মাহফিল ছিল। আলোচনা ছিল এই আয়াতের উপর–

انما الحيوة الدنيا لعب ولهو ۰ وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولايسئلكم اموالكم ۰

(অর্থ- পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, যদি তোমরা ঈমানদার হও এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না।) মুহাম্মাদ: ৩৬

এই ওয়াযের মধ্যে 'বুখল' বা কৃপনতার মন্দ দিক, ক্ষতি, গুনাহের আলোচনা হচ্ছিল এবং তুর্কিদের জন্য অর্থ সাহায্যের প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছিল। অধমের অভ্যাস সর্বদা আলোচনাকে নিজের অবস্থার সাথে মিলিয়ে দেখা। জীবনের যে অবস্থাকে আলোচনার বিপরীত দেখি সেটাকে বিশেষভাবে মনে করে রাখি। অন্য কথাগুলি সাধারণভাবে শুনি। এ ধরনের বিশেষ কথা যদি বেশি হয়ে যায় তবে সাধ্যমতো মনে রাখার চেষ্টা করি। উদ্দেশ্য এই যে, অন্তত অর্ধেক কথাও যেন মনে রাখতে পারি। কারণ সব কথা মনে রাখার চেষ্টা করতে গেলে হয়ত ঐ অর্ধেকও ভুলে যাব। আমার নিজস্ব এই পদ্ধতির ভিত্তিতে আপনার ওয়াযের মধ্যে চিন্তা করে দেখলাম যে, আমার মধ্যে 'বখিলী' আছে। এই কথাটিকে মনের মধ্যে গেঁথে নিলাম। কয়েকদিন পর্যন্ত গভীর অনুসন্ধানী হয়ে ভেবে-চিন্তে নিশ্চিত হলাম যে, আমার ধারণা সঠিক। আমার মধ্যে 'বখিলী' সীমাতিরিক্ত পরিমানে আছে। পরিধেয় বস্ত্র দান করা তো দূরের কথা ব্যবহার করতে গেলেও মনে হয় ময়লা হয়ে যাবে। মনের এই খেয়াল বাহ্য আমলে যদিও প্রকাশ পায় না কিন্তু খেয়াল অবশ্যই আসে। এতকাল এটাকে অতি সাধারণ ব্যাপার মনে করতাম। আজ চোখ খুলল এবং বুঝতে পারলাম যে, এটা হল সেই বদ স্বভাব যার মূল শেকড় রয়েছে জাহান্নামের জমিনে। কোনো বস্ত্রহীন অভাবী কাপড় চাইলে ভীষণ কষ্টকর মনে হত। বরং অন্য কাউকে নিজের পোশাক দান করতে দেখলে খুবই বিস্ময় জাগত। যখন কোথাও চাঁদা বা অর্থ সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজন পড়ত দিতাম ঠিকই কিন্তু কষ্টকর অবশ্যই মনে হত। আর এ কষ্টের ভুল ব্যাখ্যা এতদিন আমি এই করতাম যে, মনের উপর চাপ প্রয়োগের ফলে আরো বেশি সওয়াব হবে। কারণ মন দিতে না চাইলেও আমি দিচ্ছি। এই ভুলের মধ্যেই আমি ডুবে ছিলাম। কখনোই মনে হয় নি যে, এর মূল উৎস 'বখিলী'। অলঙ্কারের যাকাত আমার উপর ওয়াজিব হয়েছিল। দু-বছর ধরে তালবাহানা করছিলাম। মোটকথা চিন্তা-ভাবনার পর নিশ্চিত হওয়া গেল যে, 'সিফাতে বখিলী' (কৃপণতার রোগ) আমার মধ্যে রয়েছে।

উপরোক্ত ওয়ায শোনার পর আমার 'হালত'এর মধ্যে এমন পরিবর্তন এল যা বর্ণনা করা অসম্ভব। মনের মধ্যে এক বিস্ময়কর অবস্থার সৃষ্টি হল এবং মনে হতে থাকল যে, আমার 'কলব' ঈমান শূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও অনুভূত হত এই অবস্থা পূর্ব অবস্থা থেকে অবশ্যই ভালো। শেষোক্ত অবস্থার যদি কোনো দৃষ্টান্ত দেয়া যায় তবে সেটা এই যে, 'লম্ফ ঝম্ফকারী

প্রলাপ বকা' রুগীর 'জোলাপ' চিকিৎসা দেওয়া হলে (যার মাধ্যমে অনবরত পাতলা পায়খানা হতে থাকে) তার জ্ঞান-বুদ্ধির প্রতিবন্ধকতা ও অনুভূতির বাধাগ্রস্থতা কেটে যায়। কিন্তু জোলাপের ফলে দুর্বলতা বেড়ে যায় এবং উঠা-বসা করতেও অপারগ হয়ে যায়। যেই লোকটি অস্বাভাবিক শক্তি নিয়ে লাফা-লাফি ও ছুটা-ছুটি করছিল, প্রলাপ বকছিল, চিকিৎসার ফলে তার নিস্তেজ হয়ে যাওয়া দেখে ধারণা হতে পারে যে লোকটির শান্তি নষ্ট হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই দুর্বলতার মধ্য দিয়ে সে প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে যাচ্ছে সুস্থতার দিকে, সক্ষমতার দিকে। ঠিক এভাবেই আমার মনে হত আমার কলব ঈমান হারা হয়ে পড়েছে নাউযুবিল্লাহ্! কিন্তু জানি না কী এর রহস্য যে, আমার ভেতরটা ধীরে ধীরে ভালোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমার মন মেজাজ সুস্থ হয়ে উঠছিল। আমার এই অবস্থা পূর্বের অবস্থা থেকে অবশ্যই উন্নত। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, এটাও পূর্বের বিকৃত রুচিরই কোনো অংশ নাকি এরও কোনো ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে? সারকথা সেই বুযুর্গদের কথাটি অর্থাৎ 'ওয়ারেদাতকে গুরুত্ব দিতে নেই' স্মরণ করে এই অবস্থার ভালো-মন্দের বিবেচনা ত্যাগ করলাম এবং স্থির করলাম যে, এতে 'কলবী' হালত যাই হোক না কেন 'মরযে বুখল' বা কৃপনতার রোগ থেকে আমাকে মুক্তি পেতেই হবে। এতে আমার এখতিয়ার ও ক্ষমতার দখল আছে। আমি এর জন্য 'মুকাল্লাফ' নির্দেশপ্রাপ্ত। আমি বাধ্য।

আমি এর চিকিৎসার দিকে মনোযোগী হলাম এবং মনের অনাগ্রহকে উপেক্ষা করে খরচ করতে শুরু করলাম। সাংসারিক খরচপাতি সংকুচিত করে যাকাত আদায় করা শুরু করলাম। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পঞ্চাশ রুপিয়া (১০০ বছর পুর্বের কথা) দান করে দিলাম। সময়টি ছিল রোম সাম্রাজ্য ও বুলগেরিয়ার যুদ্ধের সময়। এই সব অর্থ 'তামলীক' করে যুদ্ধের জন্য চাঁদা হিসাবে দিয়ে দেয়া হল। কিছু অর্থ ইতিপূর্বে দেওয়া ছিল। সব মিলিয়ে এক শ রুপিয়ার কাছাকাছি হয়ে গেল। যেদিন যাকাত সম্পূর্ণ আদায় হয়ে গেল সেদিন মনে হতে লাগল যে, কলবের অবস্থা এমনভাবে বদলে গেল যেমন চোখে ছানি পড়ে বহু বছর পর্যন্ত কেউ অন্ধ হয়ে রইল এবং দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল হঠাৎ সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সে যেমন নতুন জীবন ফিরে পায়, হঠাৎ করেই সে ফিরে আসে অন্ধকার থেকে আলোর জগতে আমার অবস্থাও হয়ে গেল ঠিক সেইরকম। মনে হল যে, কলবের মধ্যে একদম কোনো পেরেশানি নেই। সেখানে বিরাজ করছে ভীষণ এক

প্রশান্তি। সব কিছুই সোজাসুজি বুঝতে পারছি। এক ধরনের ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। এবং মনের মধ্যে আশঙ্কাও জাগছিল। মনে হচ্ছিল এটা যদিও আগের চেয়ে ভালো অবস্থা কিন্তু কেমন যেন অজানা ও অচেনা। যেমন কারো কোনো হারিয়ে যাওয়া বস্তু বহুবছর পর ফিরে পেলে সেটা চিনতে বেশ সময় লাগে। অথবা যেমন কেউ দীর্ঘক্ষণ ভীষণ অন্ধকারে কাটানোর পর হঠাৎ তীব্র আলো জ্বলে উঠলে সে চোখে সর্ষে ফুল দেখতে থাকে, আমার অবস্থাও যেন তাই হয়ে গেল। প্রথম প্রথম আশঙ্কা হতে থাকল যে, এটা আগের চেয়েও বেশি মারাত্মক কোনো 'হাল' তো নয় যা আমার অপরিচিত? কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই স্পষ্টই অনুভূত হলে থাকল যে, ইনশাআল্লাহ্ এটা 'হালতে মাহমুদাহ'ই হবে। তা সত্ত্বেও আমি কিছু নফল এবং দরুদ শরীফ পড়ে দুআ করলাম–

رب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا

(অর্থ- হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং আমাকে নিজের পক্ষ থেকে দান করুন সাহায্যকারী বিজয়) ৮০:১৭

নতুন করে আবার কোনো বিপদে পড়ে যাই কিনা এই আশঙ্কায় আমি এই অবস্থার দিকে মনোযোগ দিতাম না। অবশ্য এটুকু খুবই লক্ষ্য রাখতাম যে, কিসের কারণে আমার এই উপকার হল? বহু চিন্তা-ভাবনার পর এটাই বুঝে আসল যে, পূর্ববর্তী বিপদের কারণ ছিল 'যাকাত দানে বিলম্ব' এবং 'কৃপণতা'। যাকাত আদায় হয়ে যাওয়ার ফলে আল্লাহ্ তাআলার এই অনুগ্রহ ও দয়া পেলাম। আর তখনই এই আয়াতের অর্থ বুঝে আসল–

وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكوة وهم بالاخرة هم كفرون

(অর্থ- আর দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য, যারা যাকাত দেয় না এবং যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে।) ৬–৭: ৪১

এর শুকরিয়া হিসাবে আমি তুর্কিস্থানের চাঁদা হিসাবে আরো পঞ্চাশ রুপিয়া দান করার সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে দৃঢ় করে নিলাম এবং দানের ক্ষেত্রে যদিও গোপনীয়তা উত্তম কিন্তু এই দানের জন্য প্রকাশ্য প্রচারকেই বেশি ভালো মনে করলাম। যথারীতি একটি বিশাল সমাবেশে অন্যান্য দানের পাশে প্রকাশ্যে ঐ

পঞ্চাশ রুপিয়া দানের ঘোষণা দিলাম। সভার কর্তৃপক্ষকে বললাম যে, প্রকাশ্যে এই চাঁদা প্রদানের উদ্দেশ্য এটাই যে, আপনারাও এই পদ্ধতি অন্যান্য সমাবেশে চালু করে দিন। সেই সমাবেশে আমার আত্মীয় এবং সহকর্মীদের এমন অনেকেই ছিলেন যারা জানতেন যে, আমার আর্থিক সংকট চলছে। আমার মনে হল ঐ সব লোকের সামনে এত বড় অঙ্কের চাঁদা দেয়াতে এই ধারণা হবে যে, এ লোকের অর্থ সম্পদ ঠিকই আছে কিন্তু আমাদের কাছে গোপন রাখে। আরো মনে হল- বর্তমানে এই পরিমান অর্থ আমার হাতে নেই, সুতরাং পরিশোধ করতে পারি বা না পারি এ পরিমান অর্থের বোঝা মাথায় চাপিয়ে নেওয়া ঠিক হচ্ছে না। আরো মনে হল- আমার এই দানের ফলে হয়ত ঐ সব লোক প্রশংসা করবে আর তাতে আমার মধ্যে 'উজব' রোগ (আত্মপ্রশংসা) পয়দা হবে। কোনো পরোয়া না করে আমি নিজেকেই বললাম- মনের মধ্যে নিয়ত যখন করে ফেলেছি তখন তার খেলাফ (লঙ্ঘন) করা যাবে না। দান করার নিয়ত করে যদি সেটা ভঙ্গ করি তবে তো সেই সব মুনাফেকের দলভুক্ত হয়ে পড়ব যাদের কথা আল কুরআনে বলা হয়েছে-

ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين۰ فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۰ فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۰

(অর্থ- তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল যে, তিনি যদি আমাদেরকে অনুগ্রহ (সম্পদ) দান করেন তবে অবশ্যই আমরা দান করব এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব। অতঃপর যখন তাদেরকে তিনি অনুগ্রহ (সম্পদ) দান করলেন তখন তারা তাতে কার্পন্য করল এবং কৃত ওয়াদা থেকে সরে গেল তা (ওয়াদা) ভঙ্গ করে। সুতরাং এরই শাস্তি হিসাবে আল্লাহ্‌ তাদের অন্তর সমূহে কপটতা (নেফাক) ঢেলে দেন সেদিন পর্যন্ত যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হবে। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত ওয়াদা লঙ্ঘন করেছিল এবং এজন্য যে, তারা মিথ্যা কথা বলত।) ৭৫–৭৭: ৯

আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ করে আমি যে মহাবিপদ থেকে মুক্ত হতে পেরেছি সেটার কথা ভুলে যাওয়া কোনোভাবেই আমার উচিৎ নয়। সাবধান থাকতে হবে যেন আবার সে রকম কোনো সমস্যায় না পড়ি। লোকে আমাকে ধনী মনে করলে আমার কী! মুআমালা ঠিক রাখতে হবে আল্লাহ্‌ তাআলার সঙ্গে। আর 'উজব'

এর ভয়? এতো নফসের 'শারারাত' দুষ্টামী। সময় যদি চলে যায় তবে জনগণকে তুর্কি চাঁদার জন্য উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ আর কোথায় পাব? সময় পেরিয়ে গেলে অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। মোটকথা মনের সকল ধারণা ও সংশয়ের জবাব তৈরি করে সেগুলোকে 'নফসের ধোকা' আখ্যা দিয়ে এবং 'যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তার জন্য পথ বের করে দেন এবং এমন স্থান থেকে রিযিক দেন যা সে ভাবতেও পারে না।' আয়াতের উপর দৃষ্টি রেখে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে পঞ্চাশ রুপিয়া দেওয়ার ওয়াদা ঘোষণা করে দিলাম। মানুষ যখন দেখল একটি নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার হল এবং পদ্ধতিটি চাঁদা সংগ্রহের জন্য উপকারী তখন সবাই বাহবা দিতে লাগল শাবাশ! শাবাশ!! রব উঠতে লাগল। যার কারণে 'উজব' এর ধারণাটির সত্যতা পাওয়া গেল। আমার মধ্যে এরকম আত্মতুষ্টি পয়দা হল যে, কোনো সমাবেশে পাঁচ/দশ টাকার চাঁদা কেউ দেয় না আমি দিয়েছি পঞ্চাশ টাকা। যদিও এই খেয়ালের একেবারেই পরোয়া করলাম না। কেননা এটা দানের পরে তৈরি দানের ভিত্তি নয়। এরপরও আলহামদুলিল্লাহ্, এই খেয়ালের একটি প্রাকৃতিক 'এলাজে'রও ব্যবস্থা হয়ে গেল। ঠিক তখনই মজলিসের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল- এটা তেমন কিছু নয়। আজকেই গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে মেহমানদেরকে মিষ্টি খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে বাজেট ছিল পাঁচ শ রূপিয়া। তিনি মিষ্টির পরিকল্পনা বাতিল করে পুরো পাঁচ শ রূপিই দান করে দিয়েছেন। এ ছাড়া আরো একটি 'কুদরতী এলাজ' পয়দা হল। তখনই এক বিধবা মহিলা পনের রুপিয়া পাঠালেন। অবস্থা এবং পরিমানের বিচারে ঐ দুটি দানের সামনে আমার দান কিছুই নয়। আমি প্রাণ ভরে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করলাম, আলহামদুলিল্লাহ্! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্! এরপর চিন্তা করে বুঝতে পারলাম- এখন 'বুখল' বা কৃপনতা খুবই কমে গেছে। খরচ করতে মনের মধ্যে যেভাবে বাধা তৈরি হত এখন আর তেমন হয় না।

একদিন আমি মসজিদ থেকে ফিরছিলাম। এক ভিক্ষুক এসে বলল- আমার পা খালি, জুতা ছাড়া খালি পায়ে চলছি, আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার পায়ের জুতা খুলে দিলাম। খুব লক্ষ্য করে দেখলাম 'তবীয়ত' বা 'নফস' (স্বভাব) আপত্তি করে কিনা। আলহামদুলিল্লাহ্! দেখলাম কোনো আপত্তি নেই। এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'তবীয়ত' এর পরীক্ষা করে বুঝলাম এখন আর সে সব কিছু নেই। যদি কৃপণতার কিছু থেকেও থাকে তবে তা থেকে আমি ইনশাআল্লাহ্ গাফেল নই।

বান্দার দৃষ্টিতে সুস্থতা ও অসুস্থতা নির্ণয়ের একটি স্পষ্ট আলামত ছিল 'হেরছে তআম' (খাবারের প্রতি অধিক আকর্ষণ) হাদীস শরীফ-'মুমিন এক পেটে খায় আর কাফের খায় সাত পেটে' এর আলোকে, অনেক ক্ষেত্রে চিন্তা করে দেখেছি, যাদের মধ্যে নানান প্রকারের খাদ্যের রকমারি আয়োজন এবং এ ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব প্রদানের প্রচলন আছে, তাদের অবস্থা ভালো পাওয়া যায় না। আলীগঢ় কলেজ এবং ইসলামী মাদারেসের (মাদরাসাগুলোর) মাঝে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। একজন ব্যারিষ্টারের মাসিক খাবারের ব্যয় সাত শ রুপিয়া। আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি। সাবেক 'হালতে' খাবারের লোভ ছিল এবং এ ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেওয়া জরুরি মনে হত। যেসব নেককার বুযুর্গের স্বল্প আহারের ঘটনা প্রসিদ্ধ, যেমন খাজা আলাউদ্দিন ছাবের রহ. তাঁদের প্রতি আমার এক ধরনের আপত্তি ছিল। আমি জানতাম যে আমার কলবের মধ্যে 'কুফরে'র বীজ লুকিয়ে আছে। আলহামদুলিল্লাহ্! এখন আর সে-সব কিছু নেই। (অর্থাৎ বুযর্গদের আহারের ব্যাপারেও মনের মধ্যে কোনো এ'তেরায নেই আবার খাবারের ব্যাপারেও মনের মধ্যে অধিক কোনো গুরুত্ব নেই) এখন অবস্থা এই যে, যদি দস্তরখানে পোলাও, কোর্মা এবং ডাল দুটোই থাকে, তবে দুটোই একরকম মনে হয়। আর পেট ভরে খাওয়ার চেয়ে অল্প আহারকেই আমার 'তবীয়ত' এখন বেশি প্রাধান্য দেয়। এখন অধিক খাওয়ার পক্ষের সেই সব অজুহাত ও যুক্তির কথাও মনে পড়ে না।

মোটকথা যখন থেকে আমার যাকাত আদায় হয়ে গেছে তখন থেকেই 'হালত' পাল্টে গেছে। এখন আলহামদুলিল্লাহ্, কথা ঠিকমতো বুঝে আসে। ভালো কে ভালো এবং মন্দকে মন্দ মনে হয়। উলামাদের প্রতি রগবত (আগ্রহ) এবং উমারাদের (ধনী ও শাসকদের) প্রতি বে-রগবত (অনাগ্রহ) আছে। এখন মন্দ সোহবত অথবা খবরের কাগজ পড়লেও সেই ক্ষতি হয় না যা আগে হত। বরং মন্দ সোহবত থেকেও কখনো কখনো ভালো কিছু পেয়ে যাই। (এর অর্থ এই নয় যে, এখন আমি মন্দ লোকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা জরুরি মনে করি না। জরুরি আগের চেয়েও বেশি মনে করি। ঘটনা কী ঘটেছে আমি শুধু সেটাই তুলে ধরছি।) পূর্বে কখনো যদি অনিচ্ছাতেও খারাপ সংস্পর্শে যেতাম তবে বিদ্যুৎ গতিতে খারাপের প্রভাব আমার উপর পড়ত। খারাপের প্রভাব থেকে বাঁচা আমার জন্য অসম্ভব ছিল। এখন আলহামদুলিল্লাহ্ 'মন্দ সোহবত' থেকে আমি একদমই প্রভাবিত হই না বরং আমার প্রভাবই কখনো কখনো খারাপের উপর গিয়ে পড়ে। আমার তবীয়ত (স্বভাব) 'হক' কে গ্রহণ করে

নেয় এবং 'বাতিল' কে ত্যাগ করে। এখন আলহামদুলিল্লাহ্ সেই পূর্বের 'হালত' আবার ফিরে এসেছে নতুন সংযোজনসহ। আগে তো মন্দের ইলম ছিল না এখন মন্দের ইলমও আছে। 'বিপরীত'কে দিয়েই বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। যে মানুষ মন্দকে চেনে না সে তা থেকে নিজেকে বাঁচাতেও পারে না।

এত দীর্ঘ বিবরণ আমি নিজের কিংবা হুযূরের সময় নষ্ট করার জন্য দেই নি। তিনটি কারণে বিবরণকে এতটা দীর্ঘ করার সাহস পেয়েছি।

এক– এমন মহাখুশীতে আপনার মতো এমন মুরব্বিকে কিভাবে ভুলে থাকি! আপনাকে শরিক না করে কিভাবে থাকি? কষ্ট কিংবা সুখ সব সময়ই আমি পেয়েছি আপনারই তারবিয়াত। পেয়েছি আপনারই পরিচর্যা। তাছাড়া 'যে মানুষের কৃতজ্ঞতা জানায় না সে আল্লাহ্রও কৃতজ্ঞ হতে পারে না' হাদীসের কথাটি কিভাবে ভুলে যাব? আমি একেবারে নির্দ্বিধায় হুযূরের খিদমতে আরজ করছি যে আমি এর চেয়ে বেশি হুযূরের শুকরিয়া আদায় করতে পারব না-

از دست گدائے ناتواں باید ہیچ - جز آنکہ بصدق دل دعائے بکند

(অর্থ- নিঃস্ব নিরুপায় ফকির কী-বা তোমায় দেবে! প্রাণখুলে একটু দুআই তো দেবে)

আমার মনে আছে সেই সময়ের কথা যখন ভীষণ পেরেশান হয়ে যেতাম, কোনো কিছু করতে পারতাম না, নিজের অজ্ঞাতেই দুআ করতে থাকতাম হে আল্লাহ্! আমার উপর রহমত কর আশরাফ আলীর উসিলায়, ইমদাদুল্লাহ্র এবং রশীদ আহমদের উসিলায়, তোমার সকল অলীর উসিলায় এবং আমাদের প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলায়।

দুই– দয়া করে আমাকে বলুন এ ধারণা সঠিক কিনা যে পূর্ববর্তী দূর্দশার কারণ ছিল যাকাত না দেওয়া। এমন যেন না হয় যে, কারণ আসলে অন্য কিছু, যা আমার জানাই নেই। উপকার যা হয়েছে সেটা ক্ষণিকের জন্য। মূল কারণ ভেতরে রয়ে যাওয়ার ফলে সেটা কঠিন হয়ে আবারও ফিরে আসবে।

তিন– 'যাকাত' এর মতো একটি জাহেরি আমল আদায় না হওয়ায় যদি এমন ক্ষতি হতে পারে, তাহলে 'আ'মালে কলবী'-র মতো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ত্রুটিতে না জানি আরো কতো ভয়াবহ অবস্থা হতে পারে।

হুযূরের খিদমতে আমার মিনতি যে, দয়া করে এমন কোনো পদ্ধতি আমাকে বলে দিন যাতে আমি বুঝতে পারি আমার মধ্যে কী কী 'রোগ' আছে? এবং সেগুলোর চিকিৎসাই বা কী? যেন সেগুলো থেকে মুক্তির চেষ্টা করতে পারি।

নিজের দোষ-ত্রুটি নিজে নিজে বুঝতে পারা যথেষ্ট কঠিন। আর সঙ্গী সাথীদের অভ্যাস হল প্রশংসা মুখের উপর করবে কিন্তু দোষ-ত্রুটির কথা প্রকাশ করবে না। আর তারা একে মনে করে দোষ গোপন রাখা। আমার মতে এটা দোস্তি বা বন্ধুত্ব নয় এটা হল 'তরকে এসলাহ' বন্ধুর সংশোধন বর্জন। এমন দুর্লভ ও বিরল বন্ধুও দেখেছি যিনি আমাকে ভুল ধরিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন, চিন্তা করে দেখেছি সত্যিই দোষটি আমার মধ্যে ছিল। অবশেষে আমি তা সংশোধন করে নিয়েছি। আমি সত্যিকার বন্ধুত্ব এটাকেই মনে করি।

বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীদের এই যখন অবস্থা তখন নিজের দোষ-ত্রুটি কী ভাবে জানব? এ উদ্দেশ্যে আমি আমার সম্পর্কে অন্যদের ধারণা বোঝার চেষ্টা করি তাদের কথা ও আচরণের ধরণ থেকে। এই চেষ্টায় আমার কাছে ধরা পড়েছে যে, কিছু লোক মনে করে আমি অহঙ্কারী। এটা আমার কিছু আত্মীয় ও ঘনিষ্ট বন্ধুদের ধারণা। এ বিষয়ে আমি সাধ্যমতো চিন্তা-ভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এর আসল কারণ 'আমার কম কথা বলা' এবং 'কারো ভালো-মন্দে নাক না গলানো।' তাছাড়া নিজের 'মা'মুলাত'-র (অযীফাসমূহের) পাবন্দি করতে গিয়ে সকলের সঙ্গে ততখানি মেলা-মেশা সম্ভব হয়ে উঠে না যতখানি তারা আশা করে। আর কারো ভালো-মন্দের মধ্যে নিজেকে জড়ালে সেখানে হয়ত কারো মিথ্যা শিকায়াতকে সত্য বলতে হয় অথবা বিরোধিতা করতে হয়। সত্য বললে মিথ্যা হয় এবং তাতে কারো গীবত করা হয় অথবা কারো উপর অপবাদ লাগানো হয়। বিরোধিতা সমপর্যায়ের কারো সঙ্গে হলে সেটা মূল্যহীন। আর বড়দের সঙ্গে হলে মূল্যহীন এবং বেয়াদবীও। এছাড়া বিরোধিতা করতে গেলেও কথা শেষ পর্যন্ত গীবত, শেকায়াত ও মিথ্যা অপবাদসহ আরো নানান মন্দ বিষয়ে গিয়ে ঠেকে।

আমার যেহেতু আগেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, চেনা-জানা লোকদের দ্বারা অবস্থা বেশি খারাপ হয় এবং অজানা লোকদের দ্বারা কম, এ কারণে জানাশোনা লোকদের থেকে বেশি দূরত্ব বজায়ে রাখতাম। এর ফলে তাদের ধারণা হয়েছে যে, আমি অহঙ্কারী। আমি এর পরোয়া করি নি। কারণ তাদের সঙ্গে মেলা-মেশার দ্বারা আমার দীনী ক্ষতি হয়, যা আমার কাম্য নয়। না মিশলে তারা আমাকে ভাবে 'অহঙ্কারী' কারো মুখ বন্ধ করা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ক্ষতি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে তাদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করলে আমাকে অহঙ্কারী বলা ছাড়া তারা কী ক্ষতি করবে! অজানা লোকদের থেকে যেহেতু ক্ষতি কম হয়, তাই তাদের সঙ্গে কথা-বার্তা, দেখা-সাক্ষাৎ ও

যোগাযোগের দ্বারা আমার মনের মধ্যে প্রফুল্লতা থাকে। এর কারণে এসব লোক আমাকে 'অহঙ্কারী' বলে না। বরং দেখা যায় গরিব লোকেরা আমার সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গ।

কিছু মানুষের দ্বারা বারবার আমি কষ্ট পেয়েছি কিন্তু কখনোই তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি নি। তারা আমার পিছনে নামায পড়ে না আমি যথারীতিই তাদের পিছনে নামায পড়ে যাচ্ছি। মোটকথা অজানা লোকেরা আমাকে অহঙ্কারী বলে না। জানি না কাদের ধারণা সঠিক। যারা আমাকে অহঙ্কারী বলে তাদের? নাকি যারা আমাকে নিরাহঙ্কারী মনে করে তাদের?

এতো ছিল এমন এক রোগের কথা, যার ব্যাপারে মানুষের ধারণা আমার মধ্যে রোগটি আছে। অথচ আমার ধারণা 'ওটা' আমার মধ্যে নেই। আরেকটি রোগ যার ব্যাপারে অন্যদের ধারণা যে, আমার মধ্যে নেই অথচ আমার ধারণা সেটা আছে। সে রোগটি হল 'হাসাদ' (হিংসা)। সহকর্মী বা সঙ্গীদের মধ্যে কাউকে কোনো নেয়ামত পেতে দেখলে কিছুটা খারাপ লাগে। তবে আশার কথা এই যে, সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূত হয় যে, এটা 'হাসাদ'। এর প্রতিকার হিসাবে আমি যা করি তা এরূপ- ঐ নেয়ামত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হয়ে আমার হাতে কোনো প্রকার সুযোগ থাকলে তার জন্য নিজেই প্রচেষ্টা চালাতে থাকি। এই প্রয়াস এতদূর পর্যন্ত চালাতে থাকি যে, এতে আমার ক্ষতি এবং সমস্যাও হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত কখনো এমন হয় নি যে, এ ধরনের কোনো ক্ষেত্রেই আমি নফসের ধোকা খেয়েছি। তারপরও আমার প্রশ্ন এই যে, মনের মধ্যে কারো ভালো দেখলে এই জ্বলনটুকু কেন হবে? এটা যদি 'হাসাদ' বা হিংসা হয়ে থাকে তবে মেহেরবানী করে এর কোনো 'মা'কূল এলাজ' (যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা) জানিয়ে দেবেন। এই ধরনেরই আরেকটি ত্রুটি রয়েছে আমার মধ্যে 'উজব' যা অন্যদের জানা নেই কিন্তু আমার জানা আছে। যখন আমার দ্বারা কোনো ভালো কাজ হয়ে যায় তখন মনের মধ্যে এই 'খাহেশ' (আকাঙ্ক্ষা) জেগে উঠে যে, কেউ দেখুক বা জানুক এবং প্রশংসা হোক। এর প্রতিরোধও আমি সাধ্যমতো করতে থাকি। কিন্তু কখনো কখনো এমন অবস্থা তৈরি হয়ে যায় যে, 'এলাজ' কী হবে বুঝতেই পারি না। যেমন আমার সহকর্মী যখন কোনো কাজে ত্রুটি করে এবং আমি ঠিক করি (যেহেতু সে স্পষ্ট ভুল করছে) তখন নিজের ব্যাপারে মনের মধ্যে প্রশংসা জাগবেই এটাকে আমি কীভাবে ঠেকাব? এবং নিজের সঠিক কাজটিকে ভুল এবং তার ভুলকে ঠিক কীভাবে বলব? এতদসত্ত্বেও আমার সহকর্মীকেও পরামর্শে ডাকা হলে

তার ভুল মারাত্মক এবং সকলের চোখে ধরা পড়ার মতো না হলে এবং এর দ্বারা যদি কোনো স্পষ্ট ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তবে নিজের কাজটাকেই ভুল এবং তাকেই সঠিক বলে রায় দেই এবং আমার হাত গুটিয়ে নিয়ে কাজটা তার নামে করে দেই। এই হল আমার চূড়ান্ত এলাজ ও চিকিৎসা। এতে আমার আর্থিক ক্ষতিও হয়ে যায়। কিন্তু তাতেও আমার যুক্তি এই যে, যদি নিজের কাজকে সঠিক এবং অন্যের কাজকে ভুল আখ্যা দেই তাতে তো 'উজব' হয়েই গেল। আর্থিক ক্ষতিও হল এবং মূল রোগ রয়েই গেল।

এই কয়েকটি রোগের কথা তো আমার জানা আছে কিন্তু 'সকল রোগের জ্ঞান তো চিকিৎসকের কাছে।'

হুযূরের যাত এর উপর আমি অনেক আস্থা ও ভরসা রাখি, এবারও বলছি ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই থানাভবন হাজির হব। আমার এবারের উপস্থিতি শুধুমাত্র সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নয়। এবার হাজির হব একজন তালিবে ইলম হিসাবে। ইচ্ছা রয়েছে ঈদুল ফিতরের কাছাকাছি কোনো একদিন উপস্থিত হব। অনেক বেশি বিলম্ব হল এই আবেদনপত্র লিখতে। লিখতে বসে উল্টাসোজা যা মনে এসেছে লিখে ফেলেছি এবং সেটাই পোস্ট করে দিচ্ছি। আশা করি আমার বক্তব্য এবং এর পারস্পারিক অসংলগ্নতা এবং ভাষা ও শব্দের দুর্বলতার দিকে না তাকিয়ে আমার কঠিন অবস্থার কথাগুলো বিবেচনায় নিবেন। এত খারাপ 'হালত' জানাতেও তো লজ্জা লাগে। কিন্তু কী আর করব 'ডাক্তারের কাছে তো ব্যাথার কথা গোপন করতে পারি না।'

زانکہ توہر خاررا گلشن کنی - دیدۂ ہر کوررا روشن کنی

(অর্থ- সকল কাঁটাকেই করেছ তুমি পুষ্পোদ্যান, অন্ধ সকল চোখকে করেছো আলোক দান)

আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করে সালাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। দরুদ ও সালাম পেশ করছি মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবার বর্গ ও প্রিয় সাহাবীদের প্রতি। ১৫ই জিলহজ্জ, ১৩৩১ হিজরী, মীরাঠ থেকে।

জবাবঃ হামদ ও সালাতের পর আপনার জিজ্ঞাসার জবাবে নিবেদন করছি এই যে, তরীকতের মধ্যে 'মকসূদে আসলী' বা আসল লক্ষ্য হল শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি এবং তাঁর নৈকট্য লাভ। আর এতে যত বিষয়ের দখল ও প্রভাব আছে সেগুলোই প্রভাবের পরিমান হিসাবে 'মামূর বিহি' (অবশ্য পালনীয়) আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে ও তাঁর নৈকট্য প্রাপ্তিতে কোন্ কাজে

কতটুকু ভূমিকা আছে সেটা বলতে পারেন শুধুমাত্র আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এমনিভাবে 'আসলী মাযমূম' এবং 'মুজতানাব আনহু' (প্রকৃত বর্জনীয় ও নিন্দনীয়) হল আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও তাঁর থেকে দূরত্ব। আর যতগুলো বিষয়ের দখল রয়েছে এই ক্ষেত্রে (অর্থাৎ তাঁর অসন্তুষ্টি ও দূরত্ব তৈরির ক্ষেত্রে) সেগুলো দখলের পরিমান হিসাবে 'নিষিদ্ধ'। মনে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা এটি।

দ্বিতীয় ভূমিকা এই যে, আল্লাহ্র নৈকট্য সৃষ্টিতে অথবা তাঁর থেকে দূরত্ব তৈরিতে যতগুলো বিষয়ের দখল বা ভূমিকা রয়েছে সেগুলো সবই 'এখতিয়ারী বিষয়,' (মানুষের জন্য অসাধ্য নয়, বরং তার সাধ্য ও সামর্থের মধ্যে আছে এমন বিষয়গুলোকে বলা হয় 'এখতিয়ারী বিষয়')। এগুলোর মধ্যে একটি বিষয়ও 'গায়রে এখতিয়ারী' (মানুষের অসাধ্য বিষয়) নেই। আর এটাই হল-

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

এর তাৎপর্য- (আল্লাহ্ তাআলা কারো উপর তার সাধ্যাতীত কিছু চাপিয়ে দেন না।) বাকারা: ২৮৬

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল এই যে, 'এখতিয়ারী বিষয়' ব্যাপক। এতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে 'জাহেরি দৈহিক' এবং 'বাতেনি কলবি' উভয়ই। কুরআন হাদীসের অনুসন্ধান এবং দীনী রুচি ও অভিজ্ঞতা থেকে সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণ হয় যে, 'জাহেরি বিষয়' এর অর্থ হল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল সমূহ, ভালো হোক বা মন্দ। 'বাতেনি বিষয়' এর মানে হচ্ছে আভ্যন্তরীন ও চরিত্রগত। এই 'বাতেনি বিষয়' দু-প্রকারের–

১. আকায়েদ, সহী বা বাতিল (শুদ্ধ ও সঠিক বিশ্বাস এবং বাতিল ও ভ্রান্ত বিশ্বাস) এবং আখলাক, মাহমূদাহ বা মাযমূমাহ। (প্রশংসনীয় চরিত্র, অথবা নিন্দনীয় চরিত্র।)

সুতরাং আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেই বিষয়গুলোর ভূমিকা রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ-

এক- 'আ'মালে হাসানাহ' ভালো আমলসমূহ।

দুই- 'আকায়েদে সহীহাহ' শুদ্ধ বিশ্বাসসমূহ।

তিন- 'আখলাকে মাহমূদাহ' উত্তম বা প্রশংসিত চরিত্র ও আচরণসমূহ।

মূলত এই বিষয়গুলোই পালনের জন্য শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে। এগুলোই 'মামূর বিহা' অবশ্য করনীয় ও পালনীয়।

আর যে সব বিষয়ের ভূমিকা রয়েছে আল্লাহ্ থেকে দূরত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেগুলো নিম্নরূপ-

এক- 'আমালে কারীহাহ' বিশ্রি বা মন্দ কাজসমূহ।

দুই- 'আকায়েদে বাতেলা' বাতিল ও ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহ।

তিন- 'আখলাকে মাযমূমাহ' নিন্দিত স্বভাব চরিত্রসমূহ।

ইসলামী শরীয়তে এই বিষয়গুলোই নিষিদ্ধ। মানুষের জন্য এগুলোই বর্জনীয় ও পরিত্যাজ্য।

চতুর্থ ভূমিকা যা মূলত দ্বিতীয় ভূমিকা থেকে আবশ্যিক রূপে বুঝে আসে এবং স্বতন্ত্র দলিল দ্বারাও প্রমাণিত। আর সেটা হল, যে বিষয়গুলো 'এখতিয়ার ও সাধ্যের' বাইরে সেগুলোর কোনোই দখল নেই আল্লাহ্র নৈকট্য সৃষ্টি বা তাঁর থেকে দূরত্ব তৈরির ক্ষেত্রে। যেহেতু 'নৈকট্য' ও 'দূরত্ব' সৃষ্টিতে সাধ্যাতীত বিষয়সমূহের কোনোই ভূমিকা নেই এজন্যই এগুলো 'পালনীয়' ও 'বর্জনীয়' কোনো বিষয়েরই অন্তর্ভূক্ত নয়। গায়রে এখতিয়ারী বিষয়গুলো না তো মা'মূলবিহা এবং না মানহি আনহা।

পঞ্চম ভূমিকা 'গাইরে এখতিয়ারী' (বা অসাধ্য) বিষয়গুলির অনেক প্রকার আছে। তারমধ্যে যেগুলোকে 'আল্লাহ্র নৈকট্য ও দূরত্ব সৃষ্টিকারী' হিসাবে সন্দেহ জাগে তা মাত্র কয়েকটি প্রকার। যেমন- নৈকট্য সৃষ্টির ব্যাপারে 'আহওয়ালে মাহমূদা' (প্রশংসনীয় অবস্থাবলী) ও 'কামলাতে ওয়াহাবিয়্যাহ' (আল্লাহ্ প্রদত্ত বিভিন্ন গুণ বা বুযুর্গী)।

এমনিভাবে দূরত্ব সৃষ্টির বেলায় 'ওসাবেস' (কূমন্ত্রণা সমূহ) 'খাতরাত' (শঙ্কা সমূহ) 'কবয' (নিরানন্দ)এর প্রকার সমূহ। গুনাহের প্রতি দুর্বল কিংবা প্রবল আকর্ষণ যা আকাঙ্ক্ষার পর্যায়ে পৌছে যায়। 'গায়রে এখতিয়ারী' (অসাধ্য কাজ) উক্ত প্রকার সমূহের জন্য 'নৈকট্য' ও দূরত্বে'র হুকুম প্রযোজ্য নয় শুনে আবার এটা বুঝবেন না যে, এগুলো নৈকট্য ও দূরত্ব সৃষ্টি করে না।

হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলা কাউকে আমলের কারণে অথবা একদম আপন অনুগ্রহে নৈকট্য দান করলেন এরপর তাকে ভূষিত করলেন 'কামালাতে ওয়াহাবিয়া'র (আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণের) ভূষণে। এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলা কোনো বান্দাকে 'আমালে মাযমূম' (মন্দ আমল)এর কারণে (বিনা আমলে নয়) ধিকৃত বানিয়ে দিলেন এরপর তাকে ফেলে দিলেন কোনো 'গায়রে এখতিয়ারী' (অনিচ্ছাকৃত) বিপদাপদে। কিন্তু এই বিপদ দূরত্বের 'ছবব' নয় বরং 'মুছাব্বাব'। (অর্থাৎ এই বিপদাপদের কারণে দূরত্ব তৈরি হয়

নি। বরং 'মন্দ আমল' এর কারণে আল্লাহ্ থেকে তার দূরত্ব সৃষ্টি। আল্লাহ্ তাকে এই দূরত্বের পর গায়রে এখতিয়ারী বিপদ যার প্রতিকার হতে পারে শুধুমাত্র আমালে মুবঈদা' (দূরত্ব সৃষ্টিকারী মন্দ আমল) ত্যাগ করার মাধ্যমে। উপরোক্ত ভূমিকাগুলো ভালোভাবে স্মরণ রেখে এবার লক্ষ করুন। আপনার লম্বা কাহিনীর সারবস্তু ছিল নিম্নরূপ-

১) উপলব্ধি বিশুদ্ধ হওয়া।
২) কল্যাণকর বিষয়সমূহ থেকে প্রভাবিত হওয়া।
৩) বিভিন্ন হাকীকত ও রহস্য উদঘাটিত হওয়া কিন্তু সেটাকে কামাল (বুযুর্গী) মনে না করা।
৪) এরপর ভালোর মধ্যে মন্দ এবং মন্দের মধ্যে কল্যাণ চোখে পড়তে থাকা, যদিও এই মনোভাবের কাছে আপনার পরাজয় হয় নি।
৫) ভালোর প্রভাব আপনার মধ্যে না পড়া এবং মন্দ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়া এমনভাবে যে, সেদিকে আকর্ষণ তৈরি হতে থাকে। এ ব্যাপারে আপনি কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।
৬) এই সঙ্গে আপনি এটাকে ভয়ঙ্কর মনে করেছেন এবং এই ওয়াস্ওয়াসাকে প্রতিরোধের প্রয়াস চালিয়েছেন। গৃহীত ব্যবস্থার কয়েকটি বিশদ বিবরণ।
৭) এইসব ব্যবস্থা থেকে সামান্য সময়ও গাফেল অসচেতন হয়ে গেলে সকল মেহনত ও পরিশ্রম বেকার হয়ে যেত।
৮) বাতিলকে হক মনে হত।
৯) এই শঙ্কা যে তরক্কীর (উন্নতীর) পথ বন্ধ হয়ে গেল।
১০) এরপর 'হার্টের দুর্বলতা' ও 'অনুভূতি শূন্যতার' কিছু আলামতের উল্লেখ।
১১) ভালো কথা কানে গেলে বেশি ক্ষতি হত।
১২) নিজের মধ্যে 'বুখল' (কৃপণতা) এর রোগ বুঝতে পারা।
১৩) 'এনফাক' বা খরচের মাধ্যমে তার চিকিৎসা।
১৪) ঐ চিকিৎসা 'বুখল' বা কৃপনতার পাশাপাশি অন্যান্য সাময়িক রোগের জন্যও আরোগ্যজনক ও কল্যাণকর হওয়া।
১৫) এই কল্যাণের 'শুকরিয়া' হিসাবে আরো এনফাকের (খরচের) নিয়ত করা এবং নফ্সের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিয়ত পূর্ণ করা।
১৬) কয়েকটি ঘটনা যেগুলো দ্বারা বুঝা যায় 'বুখল' বা কৃপণতার রোগ দূর হয়েছে।

১৭) লোভ-লালসার স্বল্পতা দ্বারা 'বাতেন' বা অন্তরের সুস্থতার প্রমাণ দেওয়া।
১৮) পূর্বের (প্রাথমিক) অবস্থা ফিরে পাওয়া।
১৯) ইলমের উন্নতি মন্দ সম্পর্কে সজাগ অনুভূতিসহ।
২০) নিজের অবস্থার এত বিশদ আলোচনার কয়েকটি উদ্দেশ্য।
২১) নিজের আমল অবস্থা সম্পর্কে এবং তার চিকিৎসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা, বিশেষত 'হাসাদ' (হিংসা) এবং উজব (আত্মপ্রশংসা)-এর চিকিৎসা জানতে চেয়েছেন।

আমি (থানভী রহ.) আপনার সম্পূর্ণ চিঠি অত্যন্ত মনোযাগ দিয়ে ভীষণ আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি হরফকে আলাদা আলাদা করে বরং অধিকাংশ স্থানকে বারবার পড়েছি। এ ব্যাপারে যা কিছু বুঝেছি– এবং সেটাই লিখতেও চাই, এ দাবি করতে পারব না এবং করছিও না যে, আমার এলাজ এবং আমার প্রস্তাবনাটাই একমাত্র শুদ্ধ। কিন্তু 'এনতেহাঈ খয়ের খাহী' (চূড়ান্ত হিতাকাঙ্ক্ষা) এটাই যে, নিজের জন্য যা পছন্দ হবে সেটাই অন্যের জন্য পছন্দ করবে। মনে করুন আপনি একজন চিকিৎসক, প্রিয় রুগীর বেলায় আপনি অনেক পন্থা থেকে সেটাই গ্রহণ করবেন যা আপনার নিকটে সর্বাধিক পছন্দনীয় এবং সর্বাধিক কল্যাণকর মনে হয়। এই মূলনীতির আলোকেই আমিও নির্দ্বিধায় আমার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় এলাজটাই লিখতে চাই। মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং মনঃপুত হলে অনুসরণ করুন।'

আরেফীন (বিশেষজ্ঞ তরীকতপন্থীগণ) বলেন-

طرق الوصول الى الله بعدد انفاس الخلائق

(আল্লাহ্‌কে পাওয়ার রাস্তা এত বেশি যেমন মাখলূকাতের শ্বাস) আল্লাহ্‌কে পাওয়ার পথ ও পন্থার মৌলিক নীতিমালায় কখনও কোনো রদ বদল ঘটে নি। তবে মৌলিক নীতিমালা অপরিবর্তিত রেখে রুচি, যোগ্যতা ও পারিপার্শিক অন্যান্য ভিন্নতার কারণে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঐ নীতিমালার বহু ধারা উপধারায় অনেক রদবদল ঘটানো হয়েছে। আমি যে পদ্ধতিটি আপন মুর্শিদ (আলাইহির রহমাহ্) থেকে বুঝেছি– যাকে হাজারো রুগির ক্ষেত্রে কল্যাণকর পাওয়ায় এটাকে 'চূড়ান্ত পরীক্ষিত' বলা বিলকুল সহীহ, তার সারাংশ তাই যা সংক্ষেপে উপরে উল্লিখিত পাঁচটি ভূমিকা থেকে আপনি আল্লাহ্‌র ফযলে বুঝে নিয়েছেন। কিন্তু সেটার উপকারিতাকে পূর্ণাঙ্গ সহজ ও ব্যাপক করার স্বার্থে আরো কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা তুলে ধরছি।

যে যে কষ্ট, বিপদ, বাধা ও সমস্যার কথা আপনি লিখেছেন, এগুলো কিছু মানুষের তুলনায় শতভাগের এক ভাগও নয়। (এখন এই মহূর্তে আমার এক জনের 'আহওয়াল' মনে পড়ে গেল এবং সেই অবস্থা আমাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলল। বহু কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে লেখা মওকুফ হতে দিলাম না।) কিন্তু সেই ব্যক্তি ঐ সব পেরেশানিকে মাহবুবের (প্রিয়তম আল্লাহ্‌র) নেয়ামত মনে করে গুনগুনিয়ে উঠে-

خوشا وقت شوریدگاں غمش - اگر ریش بنیند دگر مرہمش

دمادم شراب الم در کشند - اگر تلخ بنیند دم در کشند

এবং ধৈর্য ধরে বরং আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে আপন কাজে লেগে থাকেন। নিজের পরিনাম ও পরিনতির ব্যাপার আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করে দেন আর কোনো 'তাদবীর'ই (ব্যবস্থাই) করেন না। কোনো তাদবীর না করাটাই তার জন্য হাজার তাদবীরের চেয়ে বেশি কাজ দেয়। আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ সোপর্দ করার বরকতে পরিণাম হিসাবে তিনি পেয়ে যান এমন নেয়ামত-

مالاعين رأت ولااذن سمعت ولا خطر على قلب بشرای ممن لايفعل كذالك

(অর্থ- যা কোনো চোখ দেখে নি, কোনো কান শোনে নি এবং কোনো মানুষের অন্তরেও এমন কল্পনা জাগে নি, (অর্থাৎ যারা এরূপ করে নি...) তবে এই জবাব হল বিশেষ 'আহলে হাল' এর রুচির জন্য। 'আহলে এস্তেদলাল' (দলিল ও যুক্তি সন্ধানী) ব্যক্তির মনে এরপরও অপেক্ষা থেকে যাবে কিছু জানার, কিছু বিশ্লেষণের। এজন্য তার 'উসূলে এলমিয়্যা'র ব্যাখ্যাও করছি। যদিও এই ব্যাখ্যার উৎসও শেষ পর্যন্ত রুচি এবং স্বভাবগত উপলব্ধি। আমরা সকলেই জানি সব যুক্তি ও দলিল প্রমাণ (এস্তেদলাল)এর শেষ মূলত স্বভাব প্রকৃতিই (ফিতরত) হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যাটি এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা স্বভাব ও প্রকৃতিগতভাবে (ফিতরাতান) প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কম বা বেশি এমন দুটি বিষয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন যা সারা জীবনেও দূর হয় না। একটির নাম ধারণা বা কল্পনা (খেয়াল) এটির সম্পর্ক ইলমের সঙ্গে' অন্যটি হল 'মায়লানে নফস' (নফসের আকর্ষণ) এটির সম্পর্ক আমলের সঙ্গে। এদের না 'হুদুস' (সূচিত হওয়া) এখতিয়ারী আর না স্থায়িত্ব (বাক্বা) এখতিয়ারী। এ কারণে এদের প্রতিরোধ করা কিংবা নিশ্চিহ্ন

করাটাও এখতিয়ারী নয়। এমনকি হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে, একজন সাহাবীকে তিনি বলেন 'নিশ্চয় ঐ নারীর মাঝে যা কিছু আছে (সেগুলো ভিন্ন কিছু নয় বরং হুবহু) সেইরকম জিনিসই তার (তোমার স্ত্রীর) নিকটও আছে।' অন্য হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ, যার ভুল হয় যেমন তোমাদের ভুল হয়। আমিও ক্রুদ্ধ হই যেমন তোমরা হও।'

অন্য হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'ফাতরাতুল অহী'তে (অহী বন্ধ থাকার সময়ে) পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ার ইচ্ছা জাগত।

এতটুকু পার্থক্য আছে যে, সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে (খিয়াল ও অসাবেসের) কল্পনা ও কুমন্ত্রণাসমূহের এবং 'গুনাহের প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রহের' বিজয়ী হয়ে উঠার সুযোগ এসে যায়। চাই আমল করুক বা না করুক।

পক্ষান্তরে বিশিষ্টজনদের ক্ষেত্রে– যারা সাধনা (মুজাহাদা) করেছেন অথবা মুজাহাদার কায়েম মোকাম কোনো হাল 'এস্তেগরাক' ইত্যাদিকে যাদের উপর প্রবল করে দেওয়া হয় অথবা যাদের প্রাকৃতিক স্বভাবগত শক্তিগুলো দুর্বল করে দেওয়া হয়, তাদের বেলায় খেয়াল 'অসাবেস' 'গুনাহের প্রতি আকর্ষণ' ইত্যাদি মনের কোলাহল প্রবল ও বিজয়ী হতে পারে না। অথবা খুবই বিরল ক্ষেত্রে সে সুযোগ আসে কিন্তু মনের মধ্যে চলতে চলতে অথবা অল্প সময় থামতে থামতে শঙ্কা ও গুনাহের প্রতি দুর্বল-হাল্কা ধরনের আকর্ষণ তৈরি হয় কিন্তু আমল থেকে বাঁচার জন্য তাদেরও হিম্মতের জরুরত হয়। গুনাহের কাজ ঘটানোর ক্ষমতাও তাদের অটুট থাকে।

অবশ্য সাধনা না করা (গায়রে মুজাহিদ) সাধারণ ব্যক্তির সেটার (খেয়াল, ওয়াস্ওয়াসা ইত্যাদিকে) প্রতিরোধ ও প্রতিকারের প্রয়োজন পড়ে অনেক কষ্ট ও ক্লান্তির। হাকীকি মুজাহিদ বা হুকমি মুজাহিদ ওইগুলির প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সহজেই সফল হতে পারে। আর আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম এই শক্তি-সাধনা মুজাহাদা ছাড়া শুধু 'আল্লাহ্র দান' হিসাবেই পেয়ে থাকেন। যদিও তাঁরা কখনোই কোনো 'হাল' অবস্থার কাছে পরাজিত হন না। তাদের ক্ষেত্রে কোনো প্রাকৃতিক স্বভাবগত শক্তির মধ্যেও কোনো দুর্বলতা থাকে না। নফসের বিরোধিতা করার মূল পদার্থ প্রকৃতির হাতে তাদের মধ্য থেকে বের করে দেয়া হয়। আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ বিদীর্ণ করার (ছিনা চাকের) ঘটনায় তাঁর কলব মুবারক থেকে যে বস্তুটিকে বাহির করে দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় সেটা মনে হয় এই মূল পদার্থই।

(নফসের বিরোধিতার মূল পদার্থ।) আর (হ্যাঁ কিন্তু সে মুসলিম হয়ে যায় অথবা কিন্তু আমি সেই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ থাকি) হাদীসাংশের ভিত্তি এটাই মনে হয়। এছাড়া নবীগণের নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারটির সারাংশও এটাই (নফসের বিরোধিতার মূলশক্তি বের করে দেওয়া)। ব্যাপার এমন নয় যে, তাঁদের (গুনাহ থেকে) বাঁচার জন্য ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না এবং মন্দ কাজের (কাজটি ঘটানোর) ক্ষমতা থাকে না যেমন বিশেষ মুজাহাদা ও সাধনাকারীদের অবস্থা সম্পর্কে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারকথা, সর্বসাধারণের কলব বা মনের মধ্যে ওয়াস্ওয়াসা বেশি স্থান পায়। এবং গুনাহের আকর্ষণ 'আকাঙ্ক্ষা'র স্তরে পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে বিশিষ্টজনদের থেকে এদুটো দূর হয়ে যায় দুই ধরনের 'হাকীকি' ও 'হুকমি' মুজাহাদার কারণে অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওইদুটোর বাস্তবায়ন ঘটে না। বিরল ও দুস্প্রাপ্য ক্ষেত্রে তারাও মুক্ত থাকতে পারেন না। 'এই সম্ভাবনা (ওয়াস্ওয়াসা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া ও গুনাহের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ) বেঁচে থাকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে।' কিন্তু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম থেকে বিনা সাধ্য-সাধনায় সেটা নাকচ করে দেওয়া হয়।

এরপর মনে রাখতে হবে 'সালিক' ও 'মাশায়েখে তারবিয়াত'এর নিকট 'তারবিয়াত ও এসলাহ' (সংশোধন ও পরিচর্যা) এর পদ্ধতি ও পন্থায় রয়েছে ভিন্নতা। কেউতো প্রত্যেক ওয়াস্ওয়াসা প্রতিরোধের জন্য এবং প্রতিটি মন্দ স্বভাবের (খুলুকে যমীমের যেগুলোর কারণে জাহেরি বা বাতেনি গুনাহের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়) উৎপাটনের উদ্দেশ্যে আলাদা আলাদা চিকিৎসা করেন এবং চিকিৎসা করতে বলেন। সদা সর্বদা 'কলব' ও নফসের দেখভাল করতে থাকেন। যখনই আবার কোনো দোষ-ত্রুটি বা রোগ দেখতে পান আবার নতুন করে চিকিৎসা শুরু করেন। এহ্এয়াউল উলূম' এবং এ জাতীয় কিতাবগুলোর 'সুলূক' পদ্ধতির সারকথা এটাই। আপনার চিঠি থেকে বুঝা যায় যে, আপনিও সে পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন, ফলে আপনার পেরেশানি সঙ্গীন এবং কাহিনী দীর্ঘ হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ্ সফল হয়েছেন। এই সফলতা প্রাপ্তির দিক লক্ষ্য করে আপনার চিঠির জবাব দীর্ঘ না করাটাই স্বাভাবিক ছিল। কেননা যে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে তা নিয়ে তাহকীক বা গবেষণা করা অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কাজ। শুধুমাত্র শেষ দুইটি বিষয় অর্থাৎ ২০ এবং ২১ নং সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু লিখে শেষ করে দিতাম। কিন্তু আমাকে যেহেতু সামনের দিনগুলির রুটিন বলতে হবে তাই এত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন হল।

যাই হোক, 'সুলূক ও তারবিয়াতে'র একটি পদ্ধতি এটা। আপনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন এ পদ্ধতিতে কী পরিমান কষ্ট ও ক্লান্তি। আবার এত কষ্টের পরও স্বস্তি পাওয়া যায় না। যখন তখন আবারও রোগ ফিরে আসার আশঙ্কা থাকে বরং রোগ প্রত্যাবর্তনের শঙ্কাকে ছাপিয়ে আরো বড় হয়ে উঠে এই ব্যাকুলতা যে, হয়ত কোনো রোগ এখনো রয়েই গেছে। অতীতের (ভুল-ত্রুটি ও গুনাহ ইত্যাদির) ব্যাপারে আক্ষেপ রয়েছে আলাদা। মোট কথা প্রতি মুহূর্তে মনের মধ্যে আঘাত করছে তিনটি খটকা। অতীতের আক্ষেপ, বর্তমানের সংশয় এবং ভবিষ্যতের ভীতি। তরীকতের মুহাক্কিকীন, মুজাদ্দিদীন ও মুজতাহিদীন বা গবেষক ও সংস্কারকগণ (যাদের মধ্যে সর্বাধিক কামেল ও মুকাম্মিল আমার মুর্শিদ রহ.) চিন্তা করে দেখলেন বরং এলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদের দেখালেন উপরোক্ত পদ্ধতিতে অবর্ণনীয় কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াও রুহানী পরিচর্যার ফলাফল পেতে সময় লেগে যায় এত অধিক যে কখনো কখনো অবস্থা দাঁড়ায়

এই কাব্যাংশের মতো- ع تا تو بمن میرسی من بخدا میرسم

(অর্থ– যতদিনে তুমি এসে পৌঁছুবে আমার কাছে, আমি পৌঁছে যাব আল্লাহ্র কাছে।)

এছাড়া বর্তমান সময়ের মানুষের শক্তি-সামর্থ এবং হিম্মতও অল্প। এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এলহাম যোগে তারবিয়াতের একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন। সে পদ্ধতিটি এই যে, এই সব অতীত ও ভবিষ্যত আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে অন্তরায়। আল্লাহ্ তাআলা এগুলো সৃষ্টি করেছেন আপনাকে (তাঁকে) পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে। অতীত ও ভবিষ্যতের উদয়াচলের উদ্দেশ্যে নয়। মাওলানা রুমী রহ. কী চমৎকার বলেছেন-

ماضی و مستقبل پردۂ خدااست

(তোমার অতীত ও ভবিষ্যত তোমার ও তোমার মাওলার মিলনের মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছে।)

বিগত গুনাহ থেকে তওবা অনুশোচনা এবং ভবিষ্যতে পাপমুক্ত তাকওয়া পরহেযগারির জীবন-যাপনের সংকল্প করা জরুরি। সে কারণে অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখা জরুরি। কিন্তু জরুরতের উসূল হল-

الضرورة تتقدربقدر الضرورة

(জরুরি বস্তুর ব্যবহার সীমিত থাকে জরুরতের সময়কাল ও পরিমাণের মধ্যেই) এ মূলনীতির আলোকে ঐ দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করে ফেলতে হবে জরুরতের সীমার মধ্যে। অর্থাৎ অতীতের সকল গুনাহ থেকে সকল শর্তসহ খুব ভালোভাবে তওবা করার পর মনের মধ্যে এ বিষয়ের জল্পনা-কল্পনা করবে না। ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে সংকল্প করবে যে, ইনশাআল্লাহ্ তাআলা পুনরায় এই গুনাহ করব না। ব্যাস, এটুকুই। সারাক্ষণ শুধু এই কাহিনী নিয়ে পড়ে থাকবে না। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে যাকে হাদীসে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

راقب الله تجده تجاهك

(সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র ধ্যানে থাক, তাঁকে পাবে তোমার সম্মুখে)

যিকির, ফিকির এবং সাংসারিক কাজে লেগে থাকবে, এটাও যিকিরের মধ্যেই গণ্য। মোট কথা এই যে, নৈকট্য (কুরব) কে আসল উদ্দেশ্য জেনে এর জন্য নির্ধারিত কাজে লেগে থাকবে। 'আকায়েদ' সহীহ করার পর 'এখতিয়ারী' আমলসমূহ– চাই 'জাহেরি' হোক যেমন নামায এবং যাকাত, চাই 'বাতেনি' হোক যেমন 'খাওফ' (আল্লাহ্‌র ভয়) 'রজা' (আল্লাহ্‌র রহমতের আশা) 'শুকর' (কৃতজ্ঞতা) এবং 'ছবর' (ধৈর্য) ইত্যাদি, এছাড়া যিকির ও ফিকির বেশিরভাগ সময়ে এইগুলোতে মশগুল থাকবে। 'বু'দ' এর 'আসবাব' (আল্লাহ্ থেকে দূরত্বের উপকরণ ও কার্যকলাপ) অর্থাৎ 'জাহেরি' ও 'বাতেনি' গুনাহ থেকে বিরত থাকবে। এর প্রয়োজন নেই যে, 'আসবাবে কুরব' (আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ) এর মধ্যে 'মালাকা' (যোগ্যতা) সৃষ্টির চিন্তা করতে থাকবে এবং এরও দরকার নেই যে, 'আসবাবে বু'দে (দূরত্ব সৃষ্টিকারী বিষয় সমূহের)এর 'মাদ্দাহ' (মূল ও শেকড়)কে উৎপাটন করে দেবে। এখতিয়ারী বিষয়গুলোর যেটাতে ত্রুটি হবে সেটাকে ক্ষতিকর এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে এবং সেটার সংশোধন করবে। গায়রে এখতিয়ারী বিষয়গুলোর কোনো কিছু নিজের মধ্যে থাকা না থাকার দিকে একটুও ভ্রুক্ষেপ করবে না। সংশোধনের বেলায়ও খুব বেশি খুঁজাখুঁজি করবে না। যেমন কোনো জরুরি কাজে যদি গোলমাল হয়ে যায় তবে তার কাযা করে নেবে। কোনো অন্যায় কাজ ঘটে গেলে তওবা ইস্তেগফার করে নেবে। এরপর আপন কাজে মশগুল হয়ে যাবে। ঐ একটা বিষয় নিয়েই পড়ে থাকবে না। এরূপ হায় হায় করে বেড়াবে না যে, হায়! কেন ঐ কাজটি ছুটে গেল! কেন এই কাজ আমার দ্বারা হল! এগুলোকে ঐ সব মনীষী (মুহাক্কিকীন, মুজাদ্দিদীন ও

মুজতাহিদীন)গণ 'বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন' (গুলু ও মুবালাগাহ) মনে করেন, কুরআন ও হাদীস যাকে নিষিদ্ধ করেছে।

لا تغلوا فى دينكم من شاق شاق الله عليه سددوا وقاربوا واستقيموا ولن تحصوا. من غلبت النوم فليرقد. لاتفريط فى النوم انما التفريط فى اليقظة.

(অর্থ- 'দীনের মধ্যে অতিরঞ্জন করো না।' 'যে ব্যক্তি নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলবে আল্লাহ্ তাআলা তার উপর কষ্ট চাপিয়ে দেবেন।' 'সঠিক পথে চলো, মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, অবিচল থাক তোমরা কিছুতেই দীনকে সার্বিকভাবে পরিবেষ্টন করতে পারবে না।' (যদি মনে কর যে দীনের প্রতিটি বিষয়ের উপর আমল করবে, তার একটি ক্ষুদ্র অংশও ছুটতে দিবে না তবে কিছুতেই সেটা করা সম্ভব হবে না।) 'কারো উপর নিদ্রার চাপ প্রবল হয়ে গেলে তার উচিৎ শুয়ে পড়া।' 'ঘুমিয়ে থাকলে অপরাধ নেই অপরাধ জাগ্রত অবস্থায়।' হযরত আরেফ শিরাজী বলেন 'কঠোর সাধনাকারীদের জন্য জগৎটা কঠোর হয়ে যায়।'

এই 'বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন' এর মন্দ প্রভাব এ যুগের মানুষের দুর্বল শক্তি ও হিম্মতের উপর পড়ে এইভাবে যে, খুব শীঘ্রই নৈরাশ্য 'সালেক'কে অকেজো করে দেয়। এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় কখনো প্রাণ কখনো ঈমান। জীবনের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাবে সুস্থতা হারিয়ে যায়। অতিরিক্ত ভাবনা ও চিন্তার কারণে রক্তচাপ বেড়ে যায়, ঈমানের উপর এর প্রভাব এই যে, আ'মাল ও এলাজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কষ্ট ও ক্লেশ সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত সফলতা না পাওয়া অর্থাৎ রুহানী রোগ থেকে মুক্তি না হওয়া অথবা বিলম্বিত হওয়া অথবা সুস্থ হওয়ার পর আবার তা হারানোর কারণে এবং রোগ ব্যাধি বারবার ফিরে আসার কারণে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বিরক্তি এবং অভিযোগ সৃষ্টি হয়। তাঁর প্রতি সৃষ্টি হয় অসন্তুষ্টি। মনের মধ্যে ফুঁসে উঠে এই অভিযোগ যে, আমাকে এতকাল ধরে এত কষ্ট করে দেয়ালে মাথা ঠুকতে হল তাহলে-

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.

(অর্থ- যারা আমার পথে সাধনা (মুজাহাদা) করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথ দেখিয়ে দিব।) আয়াতের ওয়াদা কোথায় গেল?

এভাবে এই পন্থায় হাজার হাজার মানুষ প্রাণ ও ঈমান হারা হয়েছে। তাছাড়া নিজের আমলকে পূর্ণাঙ্গ এবং প্রচেষ্টাকে চূড়ান্ত জ্ঞান করে সর্বদা ফলাফলের প্রতীক্ষা এই পথে সার্বক্ষণিক গলার ফাঁস হয়ে যায়। ফলে নিজের আমলের

পাল্লাকে আল্লাহ্‌র দানের তুলনায় বেশি ভারী মনে হয়। যার সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, কখনোই নিজেকে সফল মনে করতে পারে না। এ কারণে অকৃতজ্ঞতার মধ্যেই পড়ে থাকে। আর নিজের ধারণা মতে যদি সফল হয়েও যায়- সেই সফলতা আবার কখনো নষ্ট হলে (এরূপ পরিবর্তন তো জীবনভর চলতেই থাকে) আবার সেই বিরক্তি ও পেরেশানি শুরু হয়ে যায়, সারা জীবনেও এর ধারাবাহিকতা আর কখনো শেষ হয় না। তার অথবা তাকে দেখে অন্যদের মন বলে উঠে আল্লাহ্‌র এই পথ থেকে আল্লাহ্‌র পানাহ চাই, যে পথে বিপদ আর অশান্তি ছাড়া সুখ আর স্বস্তির কোনো নাম নিশানা নেই।
তাহলে বুঝে দেখুন, কত বড় বিপদজনক পদ্ধতি। বিপদ নিজের জন্যও এবং অন্যের জন্যও। অতএব এই বাড়াবাড়ি ও কষ্ট-ক্লেশের ঐসব ক্ষতি ও ত্রুটি দেখে তাঁরা (পরবর্তী যুগের মুহাক্কিক ও মুজাদ্দিদ মাশায়েখ) এই প্রস্তাবনা পেশ করেছেন যে, ঐ সব সুক্ষ্মতা ও গভীরতার প্রতি একেবারেই ভ্রুক্ষেপ করবে না। যদি কোনো ভালো অবস্থা (ওয়ারেদে মাহমূদ) আগত হয় তবে না তো সেটাকে 'কামাল' (বুযুর্গী) মনে করবে, না সেটার স্থায়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, না সেটা দূর হলে (ফউত হলে) আক্ষেপ করবে। যদি কোনো ওয়াস্‌ওয়াসা মনের মধ্যে জাগে তবে সেটাকে তাড়ানোর জন্য একেবারে জীবন দিয়ে ফেলবে না। যিকিরের প্রতি খুব 'মুবালাগা' (বাড়াবাড়ি) এর সঙ্গে নয় বরং হাল্কাভাবে মনোযোগী হবে। চাই সেটা দূর হোক বা না হোক। অবশ্য এতে দূর হয়েই যায়। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে সাহস সঞ্চয় করে এর জন্যও তৈরি থাকতে হবে যে, ওয়াস্‌ওয়াসা দূর হোক বা না হোক তাতে কিছু যায় আসে না। যিকির করবে 'নৈকট্য' লাভের উদ্দেশ্যে, ওয়াস্‌ওয়াসা দূর করার উদ্দেশ্যে নয়। যদি অসাচ্ছন্দের (কবযের) অবস্থা আগত হয় সেটাকে মন্দ ভাববে না, সেটা দূর হয়ে যাওয়ার চিন্তা করবে না আকাঙ্ক্ষাও করবে না। মোটকথা সর্বদা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রার্থী এবং তাঁর অসন্তোষ থেকে পলায়নপর থাকবে। যে বিষয়গুলোর দখল রয়েছে তাঁর সন্তোষ তৈরিতে- আর তা সীমাবদ্ধ রয়েছে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল হিসাবে পালনীয় নির্দেশের মধ্যে, তার উপর আমল করবে। যদি কোনো কিছু ছুটে যায় তবে 'কাযা' করে নেবে। এটা একবারেই সহজ, কোনোরূপ কষ্ট নেই এতে। আল্লাহ্‌ বলেছেন 'তিনি তোমাদের জন্য দীনের মধ্যে কোনো কষ্ট রাখেন নি।'
আর যে বিষয়ের দখল রয়েছে অসন্তোষ উৎপাদনে- যা সীমাবদ্ধ নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে, তা থেকে বিরত থাকবে। এটাও খুবই সহজ উপরোল্লিখিত

প্রমাণের ভিত্তিতে। যদি অসন্তোষ উৎপাদনকারী কোনো কিছু সংগঠিত হয়ে যায় তবে ইস্তেগফার করবে। নিজেকে বিশিষ্টজনদের (খাওয়াছ) শ্রেণী ভুক্ত মনে করবে না এবং সর্বসাধারণের 'আহওয়াল' (অবস্থা) দ্বারা ঘাবড়াবে না। না বর্তমানে ফলাফলের প্রত্যাশী হবে না ভবিষ্যতে উন্নত মর্তবার আকাঙ্ক্ষী হবে। শুধু এই দুআ করতে থাকবে যে আল্লাহ্! আমাকে দুনিয়াতে আমলের তাওফিক দান কর, আখেরাতে জান্নাত দান কর এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিও। ব্যাস এই হল সুন্নতি তরীকত বা মাসনূন সুলূক।

উপরোক্ত বক্তব্যের উপর যদি এই সংশয় বা প্রশ্ন জাগে যে, যদি শুধুমাত্র মনের ওয়াস্ওয়াসা এবং গুণাহের প্রতি আকর্ষণ ক্ষতিকর না হয় এবং ক্ষতিকর হয় শুধু আমল তবে এটা তো সাধনা ও মুজাহাদা ছাড়াও হাসিল হতে পারে, তাহলে মুজাহাদার প্রয়োজন কি?

জবাব এই যে, সত্যিই এর জন্যে মুজাহাদা করা ফরজ বা ওয়াজিব নয়। মুজাহাদা করার মধ্যে শুধু এতটুকু কল্যাণ হয় যে, গুনাহের প্রতি মনের আকর্ষণ ঠেকাতে বেশি কষ্ট বা বেগ পেতে হয় না। খুব সহজে নফসের উপর জয়ী হওয়া যায়। মুজাহাদা না করা ব্যক্তির জন্য যা খুবই কষ্ট সাধ্য। ব্যাস মুজাহাদার মধ্যে এটুকুই লাভ।

এটা একেবারেই ভুল ধারণা যে, মুজাহাদা করলে গুণাহের প্রতি আকর্ষণই নির্মূল হয়ে যায়।

এর দৃষ্টান্ত এরকম যে, সভ্য-শান্ত ঘোড়াও কখনো কখনো বজ্জাতি করে এবং অবাধ্য হয়ে যায় কিন্তু তা জলদী আবার পোষ মেনেও যায় ঐ সভ্যতার কারণে। পক্ষান্তরে অসভ্য ঘোড়াকে পোষ-মানানো খুবই কষ্টকর হয়ে থাকে।

এবার 'সালেক' এর জন্য এসব 'ওয়াস্ওয়াসা', 'কবয' (অস্বাচ্ছন্দ) এবং গুনাহের প্রতি আকর্ষণের কতিপয় কল্যাণ ও উপকারিতার কথা বলেই এই চিঠি সমাপ্ত করতে চাই। এতে রয়েছে করুণাময়ের বেশ কিছু গোপন করুণা (আলতাফে রহমানীয়াহ) যা জানলে এ সকল বিপদে আক্রান্ত ব্যক্তি পরিপূর্ণ সান্ত্বনা লাভ করবে এবং অসংকোচে গেয়ে উঠবে-

ألالا يجأرن أخوالبلية – فللرحمن الطاف خفية.

(অর্থ- খবরদার! বিপদগ্রস্ত লোকেরা যেন ফরিয়াদ ও নালিশ না করে কারণ মেহেরবান আল্লাহ্র রয়েছে অনেক গোপন রহমত ও মেহেরবানী।)

এক- ঐ ব্যক্তি কখনো 'উজব'-এ (আত্মপ্রশংসার) আক্রান্ত হয় না। সে মনে করতে থাকে আমার হালত খুব খারাপ।

দুই- সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকে। নিজের ইলম ও আমলের ব্যাপারে গর্ব করতে পারে না। ভেতরে জাগ্রত থাকে এই অনুভূতি যে, আমার ইলম, আমল ও হাল যে কী চীয, তার আসল রূপ দেখা হয়ে গেছে।

তিন- এই দুর্গম গিড়ি যদি কেউ জীবনে অতিক্রম করে থাকে তবে তার মধ্যে শয়তানকে মোকাবেলা করার শক্তি সৃষ্টি হয়ে যায়। এগুলোর প্রতি তার মনে আর ভীতি থাকে না। সে ভাবে যে, ওয়াস্ওয়াসা... ইত্যাদি আমার কী আর ক্ষতি করবে? এগুলো তো দেখে ফেলেছি! এগুলো অতিক্রম করতে হয় নি এমন পবিত্র, কোমল ও নাজুক স্বভাব লোকের জন্য যে কোনো ক্ষতিকর সংস্পর্শ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা থেকেই যায়। যে কথাটি আমি একবার বলেছিলাম আপনাকে যে, এর কারণ মনে হয় স্বভাবের কোমলতা ও নাজুকতা।

চার- মৃত্যুর সময় যদি হঠাৎ এই অবস্থার মুখোমুখি হয়ে পড়ত তবে আল্লাহ্ জানেন পেরেশান হয়ে কী কী খেয়াল ও অলিক কল্পনা নিয়ে দুনিয়া ছাড়ত। এই সর্বনাশা ঘাঁটি যদি কারো জীবনে একবার এসে চলে যায় তবে তার মধ্যে এগুলো বরদাশ্ত করার শক্তি ও সামর্থ এসে যায়। এরপর মৃত্যুর কঠিন মুহূর্তেও এরূপ ঘটলে সে পেরেশান এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রতি বদগুমান (খারাপ ধারণা পোষণকারী) হবে না। এতমিনান (স্বস্তি) এবং আল্লাহ্র মহব্বত নিয়েই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে।

পাঁচ- এই ব্যক্তি অভিজ্ঞ হয়ে যায়। অন্য বিপদগ্রস্থকে সাহায্য করতে পারে খুব সহজে।

ছয়- সে সর্বক্ষণ নিজের উপর আল্লাহ্র রহমত দেখতে পায়। মনের মাঝে এই অনুভুতি সজাগ থাকে যে আমার মতো এত বড় নালায়েককে আল্লাহ্ এত নেয়ামত দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

সাত- ঐ হাদীসের তাৎপর্য একেবারে খোলা চোখে দেখতে পায় যে, মাগফেরাত বান্দার আমলের দ্বারা হবে না, হবে রহমান এর রহমত দ্বারা।

এমনি আরো অনেক অনেক কল্যাণ রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। আমি এ ধরনের কল্যাণ ও উপকারিতার দিকেই ঈংগিত করে বলেছিলাম যে, কোনো 'হালতে মাহমূদাহ' আসন্ন।

আশা করি আগোছালো হওয়া সত্ত্বেও আমার বক্তব্যকে আপনার জিজ্ঞাসার বিভিন্ন অংশের সাথে মিলিয়ে নেবেন এবং ইনশাআল্লাহ্ তাআলা সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন। প্রত্যেক জিজ্ঞাসার প্রতিটি অংশের জবাব দেওয়ার

প্রয়োজন বোধ হয় নি আমার। শুধুমাত্র শেষের দুটি বিষয় অর্থাৎ ২০ ও ২১ নং সম্পর্কে- মূলত জিজ্ঞাসার মূল অংশও সেটুকুই, দু-চারটি কথা লিখে দেওয়া সমিচীন মনে করছি।

আপনার বক্তব্য 'তিনটি কারণে বিবরণ এত দীর্ঘ করেছি... দুই- কারণ যাকাত'...

জবাবঃ দয়া করে কারণ খুঁজে হয়রান হবেন না। কারণের চিন্তা করবে না। রোগ পুনরায় ফিরে আসার ব্যাপারেও কোনো আশঙ্কা করবেন না। নফ্সকে জানিয়ে দিন 'যদি তুমি আবারও দুষ্টামি কর তবে আমিও আবার সেই চিকিৎসাই নিব। আপনার বক্তব্য 'তিন- যাকাতের মতো একটি জাহেরি... আমার কী কী রোগ...'

জবাবঃ নাতো 'আমরায' (রোগসমূহ) এর ফিকিরে পড়বেন, না বিস্তারিত চিকিৎসার।

আপনার বক্তব্য- 'আমার মধ্যে অহঙ্কার আছে' 'হাসাদ' 'উজব'...

জবাবঃ এসকল চিন্তাই বর্জন করুন। ধরে নিলাম আপনার মধ্যে ওগুলো আছে, ঐ সব আখলাকের মূল (মাদ্দাহ) থাকাটা ক্ষতিকর নয়। ক্ষতিকর হল তার উপর আমল করা। আমলের মধ্যেও শুধু সেটাই ক্ষতিকর যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না করেন তাহলে সেটা আমল নয়, সেটা হল ওয়াস্ওয়াসায়ে আমল।

এখানেই শেষ করছি কথা।

আপনাকে এবং আমার নিজেকে (নফসকে) সোপর্দ করছি শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী মহান আল্লাহ্র উপর। ইনশাআল্লাহ্ আমার ও আপনার আমাদের সকলের শুভ পরিণতির আকাঙ্ক্ষা রাখি। সকল কথায়, সকল স্থানে তিনিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী।

(এই বক্তব্য লিখেছেন আশরাফ আলী এক বৈঠকে যার পরিমান ছিল তিন ঘণ্টা। ১৮ই মুহাররম ১৩৩২ হিজরী।)

উপকৃত হওয়ার জন্য পীর ও মুরীদের রুচি অভিন্ন হওয়া শর্ত এবং হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. এর ব্যতিক্রমী সংশোধনী রুচি

হালঃ হুযূর! আস্সালামু আলাইকুম ওয়াআলামান লাদাইকুম...

হুযূরের সম্ভবত মনে আছে যে, আমি... সিলসিলাভুক্ত এবং এমন এক পীরের দস্ত মুবারকে 'বাইআত' হয়েছি যার জাহেরি ওফাত (ইনতেকাল) এর পর

তাঁর মতো এমন জাহেরি ও বাতেনি কামালাত (বুযুর্গী) সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আজ পর্যন্ত আর চোখে পড়ে নি। যার মহান চরিত্র ছিল 'মুহাম্মদী চরিত্রের বাস্তব নমূনা' এ কথার স্বীকৃতি সিলসিলাভুক্ত ব্যক্তিগণ এবং অন্য লোকেরাও দিত। কিন্তু হায় আমার দুর্ভাগ্য! এমন জালাল ও জামালে রহমানীর মাযহার (মহান ব্যক্তি) পেয়েও নিজের গাফলাত ও অবহেলার কারণে উপকৃত হতে পারি নি। আজও আমার মনে হযরত মাওলানা... এর মহব্বত জীবন্ত হয়ে আছে এবং ইয়াকীন রয়েছে যে, মৃত্যু পর্যন্ত এই মহব্বত অবিকৃত থাকবে। অনেক বড় বড় বিখ্যাত মাশায়েখকে দেখেছি কিন্তু মাওলানার কাছাকাছি ভক্তিও কারো প্রতি জাগে নি। আল্লাহ্ জানেন এটা কি আমার মাহরূমির আলামত নাকি কোনো একদিন এই বিশাল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ গাফলাত ও অবহেলার স্তুপ থেকে বেরিয়ে আমার অস্তিত্বকেও জ্বালিয়ে দেবে।

آفاقہا گردیدہ ام - مہرتباں دزدیدہ ام

بسیار خوباں دیدہ ام - لیکن تو چیزے دیگرے

অর্থ- বিশ্বজগত ঘুরে এসেছি, মুদ্রা মহর ঢের এনেছি। ঢের দেখেছি রূপের মেলাও, তুলনা তোমার পাই নি কোথাও।

কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে মাওলানার জীবদ্দশাতেই আমার হৃদয়ের একটি কোণ ঝুঁকে ছিল তাঁর দিকে যিনি মহান, শ্রদ্ধেয়দের কাছে ছিলেন শায়খুল আলম, এবং খাসরুল কুল এবং সে যুগের সকলের কাছেই ছিলেন আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক। যদিও নিজ মুর্শিদকেই মনে করতাম ফয়েয ও বরকতের উৎস, তথাপিও একটি পোস্টকার্ডে একবার আমি নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়ে সাক্ষাতের ইচ্ছা ও দুআ চেয়ে হযরত হাজী সাহেব কেবলার বরাবর সাহারানপুর মাদরাসা থেকে পাঠিয়েছিলাম। ঐ কার্ডের যদিও কোনো জবাব পাই নি এবং কয়েক মাস পরেই হযরত হাজী সাহেব কেবলার বেছাল (ইনতিকাল) হয়ে গেছে। বেছালের পর এ অধম এক স্বপ্ন দেখে যা দ্বারা একদম কামেল একীন হয়ে গেছে যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার ঐ কার্ডের জবাব। আমার মন চায় আল্লাহ্ তাআলা যেন এমন একটি সুযোগ করে দেন যে, আমি সামনা সামনি হুযূরকে স্বপ্নটি বলব এবং মিনতি করে বলব আল্লাহ্র ওয়াস্তে স্বপ্নটির ব্যাখ্যা পূরণ করে দিন, যা পূরণ করার ক্ষমতা এ মুহূর্তে সম্পূর্ণ আপনার মুঠোর মধ্যে রয়েছে।

স্বপ্নের বিষয়টি সবিস্তারে আমি লিখতে সংকোচ বোধ করছি। আমার কলমকেও সে স্বপ্ন জানতে দিব না। আমি চাই সেটা শুধু আপনাকে বলতে।

غیرت از چشم برم روئے دیدن ندہم - گوش را نیز حدیث تو شنیدن ندہم

(অর্থ- আমার সংকোচ এতই বেশি যে, তোমার চেহারা দেখতে দিব না খোদ চোখকেও কর্ণকেও শুনতে দিব না তোমার কথা।)

হযরত হাজী সাহেবের ইন্তেকালের পর মনে হয় যেন জগৎটাই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সে অন্ধকারে চতুর্দিক দৃষ্টি ফেলে, অন্ধের মতো হাতড়াতে থেকেছি কিন্তু নৈরাশ্যের ভয়ানক রূপ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে নি। বারবার দিল থেকে এই আওয়াজ উঠেছে-

تہیدستان قسمت راچہ سود از رہبر کامل - کہ خضر از آب حیوان تشنہ می آرد سکندرا

(অর্থ- 'কামেল পীর পেলেও কী লাভ তাতে, যদি হয় নিজের কপাল পোড়া। আবে হায়াত পান করে হযরত খিজির অমরত্ব লাভ করলেও সিকান্দার পানির পিপাসায় ছটফট করল।)

কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও ঐ স্বপ্ন আমাকে একটু আলোর ঝলক দেখিয়ে দেয়। হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেয় আশার প্রদীপ। যেন আমাকে বলে যায়-

لاتقنطوا من رحمة الله

('আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না')

আমার মুর্শিদ ও পীর সাহেবের ইন্তেকালের পর আমার অন্তরে মানবীয় ত্রুটিবশত আপনার ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ ছিল যা প্রকাশ করা আমার জন্য ভীষণ লজ্জাজনক। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্‌, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্‌ মুজাফ্‌ফর নগরে জগৎ আলো করা সৌন্দর্য (আপনার চেহারা মুবারক) এক নজর দেখার পর হৃদয়ের অন্ধকার রহমতের আলোতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। হুযূরের যিয়ারত আমার অন্তরকে আচ্ছাদনকারী সকল সন্দেহ ও ধারণাকে বের করে দূরে নিক্ষেপ করেছে।

آے خدا قربان احسانت شوم - ایں چہ احسان است قربانت شوم

(অর্থ- হে আল্লাহ্‌! তোমার এহসান ও দয়ায় আমি কুরবান ও উৎসর্গীত। কী চমৎকার এহসান তোমার, আমি উৎসর্গীত!)

বর্তমানে হৃদয়ে ইশকের আগুন দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুর্শিদের জ্বালানো সেই অগ্নিতে সময়ের দৈর্ঘ আর আমার গাফলত জমিয়ে তুলেছিল ছাই এর স্তুপ, হুযূরের বৈদ্যুতিক শক্তির ভীষণ আকর্ষণ আবার তাকে করে তুলেছে দ্বিগুণ। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। এই পথভোলা পথিককে সাহায্য করুন। যেই চিরস্থায়ী দৌলতের আকাঙ্ক্ষা এক মহান বুযুর্গের দস্ত মুবারকে আমার হাত সমর্পন করে দিয়েছিল দুর্ভাগ্যক্রমে যেই দৌলত থেকে আমি মাহরূমই রয়ে গেছি, দয়া করে সেই দৌলত আমাকে দান করুন। আপনার মহান মুর্শিদ (হযরত হাজী সাহেব) এর রুহানী অসিয়তও স্বপ্নযোগে এই অক্ষমের পক্ষে রয়েছে। আমার বর্তমান হালত হুবহু এই পংক্তির মতো-

دو گونہ رنج عذاب است جان مجنوں را - بلائے صحبت لیلیٰ وفرقت لیلیٰ

(অর্থ- মজনু প্রেমিকের যাতনা দ্বিগুণ, লায়লার মিলন ও বিরহের আগুন।)

মাদরাসায়ে দীনীয়াতে দেখমত করা এবং হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা এবং বর্তমানে যেখানে খেদমতে আছি সেখানের পেরেশানির কথা যেমন সময়মতো অযিফা না পাওয়া, মাঝে মাঝে চাঁদা উঠাতে যাওয়া ইত্যাদি বিষয় জানিয়ে আমি হুযূরের কাছে মশওয়ারা চেয়েছিলাম। বিশেষভাবে জানতে চেয়েছিলাম যে মাদরাসার শিক্ষকতা করা বেশি ভালো নাকি মসজিদে ইমামত। সবশেষে হুযূরের কাছে দীর্ঘ চিঠির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

বিশ্লেষণঃ আপনার চিঠি- যাকে বলা যায় সরল সত্য স্বীকৃতি ও বিবৃতি, পেয়ে আশ্বস্থ হলাম। 'সত্যের জবাব সত্য ছাড়া আর কী?' এর ভিত্তিতে জরুরি মনে করছি যে, চিঠি পড়ে যা মনে এসেছে নিঃসংকোচে সোজাসুজি প্রকাশ করে দেই। সেগুলো মোটামুটি পাঁচটি বিষয়-

১. এই পথে প্রত্যেক পথিকের রুচি পৃথক হয়ে থাকে।

২. উপকৃত হওয়ার জন্য রুচির অভিন্নতা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

৩. মুর্শিদ ও পীর নির্ধারণে তাড়াহুড়া করা তরীকতের অন্যতম নিষিদ্ধ বিষয়।

৪. দীর্ঘ সোহবত (বা দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ) ছাড়া কারো রুচি সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি হয় না।

৫. আমার রুচি মরহুম মাওলানার (আপনার পীরের) রুচি থেকে অনেক বিষয়েই ভিন্ন।

এগুলো ছিল ভূমিকা। এবার আসল উদ্দেশ্যের বিবরণ তুলে ধরছি। কোনো মুসলিমের খেদমত করতেই আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার মঙ্গল এতেই যে, এই নির্বাচনে তাড়াহুড়া করবেন না ৩.নং বিষয়ের কারণে। কেননা আমার রুচি আপনার রুচির সঙ্গে নাও মিলতে পারে ১.নং-এর কারণে। এতে আপনার কোনো উপকার হবে না ২.নং বিষয়ের কারণে। বরং আপনার জন্য জরুরি এই যে, 'বার বার সাক্ষাৎ করতে থাকুন' 'গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন' অথবা 'দীর্ঘসময় যাবত পত্র যোগাযোগ রক্ষা করুন' কারণ এটাও সাক্ষাতের মতোই (মুলাকাতে হুকমি) চতুর্থ বিষয়টির কারণে।

আপনি যদি ইতিমধ্যে মাওলানা মরহুমের (আপনার পীরের) রুচিতে নিজেকে রঙ্গিন করে নিয়ে থাকেন তবে আমার রুচি-পছন্দ আপনার ভালো লাগবে না পঞ্চম বিষয়টির কারণে। যদিও খারাপ ধারণাও হয়ত হবে না, রুচির ভিন্নতাকে স্বভাবগত ও বিশ্লেষণগত মনে করার কারণে।

আর যদি পুরাপুরি নিজেকে না রাঙিয়ে থাকেন অথবা রাঙিয়েছিলেন বটে কিন্তু বর্তমানে সে ব্যাপারে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে, অবস্থার বদল হলে যেটা হওয়াও সম্ভব, তাহলে আমার সঙ্গে আপনার রুচি পছন্দের মিল ঘটতেও পারে। তেমন হলে তখন আপনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা গ্রহণযোগ্য হবে। নতুবা (অর্থাৎ আমার সঙ্গে রুচি-পছন্দের মিল হওয়ার পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে) নিজ সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করার প্রয়োজন হয়ে যেতে পারে। প্রত্যাহারের কথা প্রকাশ করলে সেটা তিক্ততার সৃষ্টি করবে আর গোপন করলে বাড়বে সংকোচ ও পেরেশানি। উভয়টাই ক্ষতিকর।

এবার প্রসঙ্গক্রমে আমার রুচি-পছন্দের কিছু ক্ষুদ্র দিকও তুলে ধরছি-

১. 'রিয়া' লোক দেখানো প্রবণতার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা।

২. 'নফসানী তাসাররুফাত' বা বশীকরণ ইত্যাদিকে পছন্দ না করা।

৩. ভাব গাম্ভীর্যের ব্যাপারে সংকোচ।

৪. রসম-রেওয়াজের সাথে কিছুতেই নিজেকে না জড়ানো, এমন কি সেগুলো জায়েয হলেও।

৫. বিরোধীদের মোকাবেলা না করা।

৬. আমার কাছে 'আহওয়াল' বা অবস্থাবলীর গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব আছে শুধু আমালের (কাজের)।

৭. আমার নিকট সাধনা বা মুজাহাদা মানে গুনাহ ত্যাগ করা আর মুবাহ কম করা, মুবাহ ত্যাগ করা নয়। এমনি ধরনের আরো অনেক কিছু...

সর্বশেষ যে বিষয়টি আপনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন সে ব্যাপারে আমার বক্তব্য- তা'লীমের (শিক্ষকতার) কাজকে আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি এই শর্তে যে, অযিফা (বা বেতন) পেতে যেন পেরেশানি না হয়। আর চাঁদা উঠানোকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করি। উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে তালীমের কাজ যদি না পাওয়া যায় তবে শেষ পর্যায়ে হল ইমামতি ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও আংশিক বিষয়ের জন্য পরামর্শ দেওয়া আমার নীতিবিরুদ্ধ। যে মৌলিক নীতিমালা বলেছি সেগুলোর আলোকে নিজের বিষয়গুলোকে মিলিয়ে নেবেন। জরুরি প্রয়োজনের কারণে চিঠিকে দীর্ঘ করা দোষণীয় নয়।

প্রথম অধ্যায়
পীরের সোহবত ও বাইআতের বর্ণনা

বাইআতের উদ্দেশ্য দীনদারীর সংশোধন

হালঃ হুযূরে আলী বাইআত করে নেয়ার পর থেকে এই গোলামের গৃহ থেকে জিন্নাতের ঝামেলা মিটে গেছে। বৎসরাধিক কালের জ্বর ভালো হয়ে গেছে। এখন নাতো রুগীর কোনো সমস্যা আছে না তার শিশু সন্তানের উপর কোনো আছর আছে। কিন্তু এই গোলামের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। রমযানের শেষের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়ি। সেই অসুস্থতা ও দুর্বলতার কারণে এখন পর্যন্ত পরিশ্রম ও মেহনত করতে পারছি না। যিকিরের দ্বারা অর্জিত সামান্য একাগ্রতাটুকুও নষ্টের পথে। আগের উৎসাহ উদ্দীপনাও আর নেই।

আমার বড় শ্যালিকা বাইআত হওয়ার ভীষণ আগ্রহী হয়েছে তার বড় বোনের অবস্থা শুনে। যেহেতু স্বামীর সঙ্গে তার ঝগড়া-ঝাঁটি ছিল এজন্য আমি তাকে আখলাক সুন্দর করার উপদেশ দিয়ে বলেছি- এটা করতে পারলে আমি হুযূরের কাছে বাইআতের ব্যাপারে লিখব। তিনি বারবার তাড়া দিচ্ছেন। হুযূরের এ ব্যাপারে কী মত?

বিশ্লেষণঃ আপনার ঘরওয়ালীর সুস্থতার খবরে খুশী হলাম। আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করুন এবং সবসময় আপন হেফাজতে রাখুন। তবে এ খবর শুনে তার বোনের যে বাইআতের আগ্রহ জেগেছে এটা তার অজ্ঞতার প্রমাণ। না এটা কোনো কামাল (বুযুর্গী) এবং না এর সঙ্গে বাতেনের (অন্তরের) কোনো সম্পর্ক আছে। এটাও নিশ্চিত নয় যে, সুস্থতার মধ্যে বাইআতের কোনো প্রভাব আছে। বাইআত তো দীনদারী সংশোধনের জন্যে। এজন্য উপকরণ (আসবাব)এর শক্তি ও তার হাকীকত সম্পর্কে তাকে বোঝাতে হবে। সেটা বোঝার পর দেখুন তার সিদ্ধান্ত কী হয়?

'উৎসাহ' 'উদ্দীপনা' ও 'একাগ্রতা' এগুলো নিয়ে পেরেশান হবেন না, এগুলো উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং কাজ শুরু করে দিন। খুব ভালো করে মনে রাখবেন- আসল উদ্দেশ্য 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি।'

যে পীরের অধিকাংশ মুরীদ বেনামাযী তিনি পীর হবার অযোগ্য

প্রশ্নঃ যে পীরের বেশিরভাগ মুরীদ বরং বলা যায় প্রায় সকল মুরীদ বেনামাযী তিনি কি অন্যকে বাইআত করার যোগ্যতা রাখেন?

জবাবঃ যোগ্যতা রাখেন না।

বেলায়াত (অলীত্ব) দান করা পীরের এখতিয়ারে নয়

প্রশ্নঃ বেলায়াত কি এমন বস্তু যা পীর সাহেব যাকে তাকে 'যাও, এই আমানত তোমাকে সমর্পণ করলাম' বলে দিয়ে দিতে পারেন?

জবাবঃ বেলায়াত এরূপ কোনো বস্তু নয়। কোনো কোনো 'কাইফিয়াত' (মনের অবস্থা) এর ক্ষেত্রে ঐরূপ হতে পারে, বেলায়াতের ব্যাপারে যার কোনো দখল নেই।

কবীরা গুনাহের কারণে বাইআত বাতিল হয় না

হালঃ অপদার্থের জাহাজ কবীরা গুনাহসমূহের সাগরে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই নিকৃষ্ট পাপী বর্তমানে খুব খারাপ অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। বেশ কয়েকবার কবীরা গুনাহে জড়িয়ে পড়েছি। প্রত্যেকবারই তওবা করেছি। হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গোহী রহ.এর জীবনী গ্রন্থ থেকে 'কবীরা গুনাহের কারণে বাইআত নষ্ট হয়ে যাওয়া'র বিষয়টি জানতে পারলাম। এই বিষয়টি জানার পর আরো বেশি পেরেশান হয়ে পড়েছি।
দয়া করে অধমের কলবের দিকে 'খাস' তাওয়াজ্জুহ প্রদান করবেন, হিম্মত প্রদান করে কলবের এসলাহ করে দেবেন এবং খবর নেবেন।

বিশ্লেষণঃ আমার মতে বাইআত নষ্ট হওয়ার বিষয়টি ঠিক নয়। যদি কথাটি হযরত গঙ্গোহীর হয় তবে কথাটির ব্যাখ্যা করতে হবে। অর্থাৎ বাইআত নষ্ট হওয়া মানে বাইআতের বারাকাত নষ্ট হওয়া। আর যদি কথাটি অন্য কারো হয় তবে সেটা 'হুজ্জত' বা দলিল নয়।
'গুনাহ ত্যাগ করা' এবং 'তওবা করা' একাজ করতে হবে আপনাকে। আপনার করণীয় কাজের মধ্যে আমি কী খবর নিব?

মুরীদের উচিৎ পীরের নিকট খারাপ অবস্থাও প্রকাশ করা

হালঃ বেশিরভাগ সময় নিজের অবস্থা জানাতে ইচ্ছা হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার এটাও মনে হয় যে, এই সব আজে-বাজে বিষয় কী জানাব! জানানের মতো ভালো কিছু করাই হয় না। এজন্য কিছু জানাতে লজ্জা লাগে।